দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭২ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯
১৫ ভাদ্র - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১
website : www.eswastika.com

প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে গড়ে উঠবে 'নতুন কাশ্মীর'

- জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আগামী সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সামিট হচ্ছে শ্রীনগরে।
- মুকেশ আম্বানী-সহ বেশ কয়েকজন শিল্পপতি কাশ্মীরে বৃহৎ অঙ্কের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।
- কেন্দ্রীয় উন্নয়ন প্রকল্পগুলির লাভ প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে জম্মু ও কাশ্মীরের ৩১৬টি ব্লক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে।

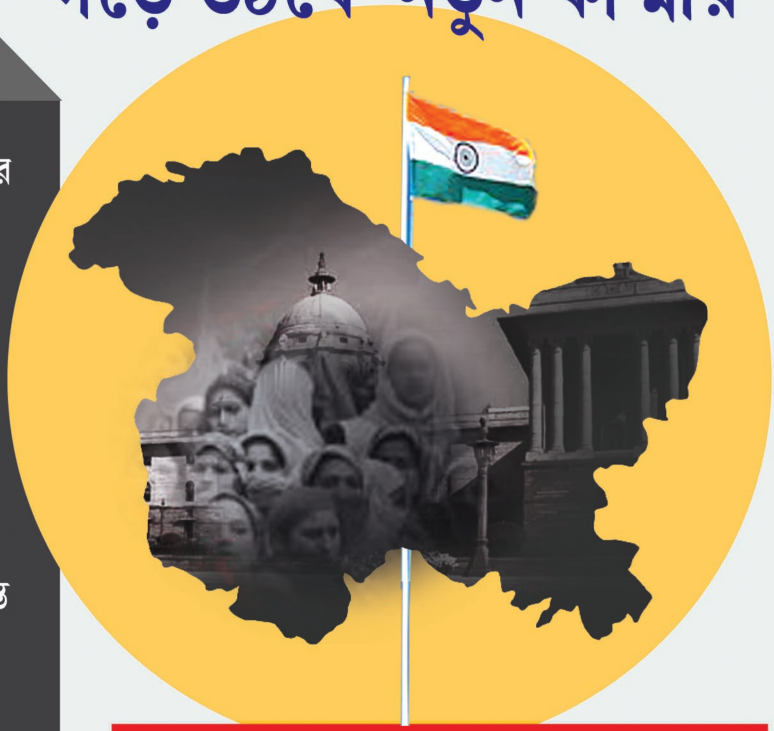

এক দেশ, এক নিশান, এক বিধান

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ।।

৭২ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৫ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২ সেপ্টেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

কমিউনিস্টদের শিক্ষাদীক্ষা ও শালীনতা-ভদ্রতা
□ বিশ্বমিত্র □ ৬

খোলা চিঠি : নুনভাতে নাহি খেদ, ডিম খেলে বাড়ে মেদ □
সুন্দর মৌলিক □ ৭

চীন-পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া
□ ব্রহ্মা চেলানি □ ৮

বিশ্ববিমুখ পাকিস্তানের পাশে শুধু ভারতীয় 'সমব্যথীরা'
□ সাধন কুমার পাল □ ১১

রাজনীতির কারণেই ভারতে জাতপাতের রমরমা
□ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১৩

বাংলা ভাষার ইসলামিকরণের ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ
□ সৌভিক রাতুল বসু □ ১৫

মোদীর কাছে চিরঋণী থাকবেন মুসলমান মহিলারা
□ রণিতা সরকার □ ১৭

শেখ হাসিনার সরকারের পিছনে মূল রাজনৈতিক শক্তি কি হেফাজতে ইসলাম? □ ১৮

মুসলমানের মানবাধিকার আছে, হিন্দুর নেই
□ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ২৩

প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে গড়ে উঠবে 'নতুন ভারত'
□ সুজিত রায় □ ২৪

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ ও বামপন্থীরা
□ ড. জিষ্ণু বসু □ ২৬

আদর্শ শিক্ষক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন □ ধীরেন দেবনাথ □ ৩৯

গল্প : নতুন ঠিকানা □ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৩৪

কমিউনিস্ট নির্মিত কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদের পরিসমাপ্তি
□ অভিমন্যু গুহ □ ৪০

তাঁর চরিত্রের বর্ণময়তা বিরুদ্ধবাদীরাও তল করতে পারতেন না
□ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪৩

ভারতের স্বাধীনতা ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনী
□ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ৪৪

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □ **সুস্বাস্থ্য: ২২** □ **রঙ্গম : ৩৯**□ **চিত্রকথা : ৪২** □ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৭** □ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৪৯**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৯ সেপ্টেম্বর
২০১৯

প্রকাশিত হবে
৯ সেপ্টেম্বর
২০১৯

আগামী সংখ্যার বিষয়

মমতা ব্যানার্জির চায়ের আসর

সস্তা চমক দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জুড়ি মেলা ভার। বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ওর টুইস্ট। কাটমানি ফেরত, দিদিকে বলো, কচুয়ায় পদপিষ্ট হয়ে যারা মারা গেছেন তাদের পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ, রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে চা খাওয়া— এসবই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চমক। উদ্দেশ্য, নিজের নষ্ট হয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি উদ্ধার করা। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়, মমতা ব্যানার্জির চায়ের আসর। তিনটি বিশেষ রচনায় থাকবে তাঁর সস্তা চমকের বিশ্লেষণ।

সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata**

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নূতন কাশ্মীর প্রতিভাত হইতেছে

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। অন্ধকারের অবসান ঘটাইয়া এক নূতন যুগের সূচনা হইয়াছে কাশ্মীরে। শুধু কাশ্মীরের অধিবাসীরা নহে, সমগ্র দেশবাসী মনে করিতেছে, ৩৭০ ধারা প্রত্যাহৃত হইবার পর এইবার সত্য সত্যই কাশ্মীরে এতদিনের অনাচারের অবসান ঘটিবে। যে ভারত-বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি কাশ্মীরকে নরকে পরিণত করিয়াছিল, তাহারা এইবার নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িবে। এইবার কাশ্মীর সত্য সত্যই ভূস্বর্গে পরিণত হইবে। ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লাহ, পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি-সহ কংগ্রেস এবং বামপন্থী নেতা-নেত্রীরাও ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর বলিয়াছিলেন, এইবার কাশ্মীরে আগুন জ্বলিবে। কর্মক্ষেত্রে দেখা গেল, তাহাদের এই আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। বরং, কাশ্মীর ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরিতেছে। পাকিস্তান অবশ্য নানাবিধ প্ররোচনা দিয়া কাশ্মীরে হিংসা ছড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কাশ্মীর শান্ত থাকিয়া প্রমাণ করিয়াছে, পাকিস্তানের প্ররোচনায় পা দিবার মানুষের সংখ্যাও কাশ্মীরে কমিয়া গিয়াছে। ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর সমস্তরকম অমূলক আশঙ্কা, মিথ্যা প্রচার এবং প্ররোচনাকে নস্যাৎ করিয়া কাশ্মীর যেভাবে ছন্দে ফিরিতেছে তাহাতে আর একটি বিষয়ও পরিষ্কার হইতেছে। বুঝা যাইতেছে, সাধারণ কাশ্মীরিরা ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছে এবং জেহাদি-জঙ্গিমুক্ত এক শান্ত-সমৃদ্ধ কাশ্মীরই তাহাদের কাম্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই শান্ত-সমৃদ্ধ কাশ্মীরই তাহাদের উপহার দিতে চাহিতেছেন।

গত সাত দশকে কাশ্মীরে বিশেষ কিছু রাজনৈতিক পরিবার, রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি যতই বিদেশি অর্থে এবং ক্ষমতায় পুষ্ট হইয়া উঠুক না কেন, সাধারণ কাশ্মীরিরা যথেষ্ট দুর্দশার ভিতর দিন কাটাইয়াছেন। পর্যটন ব্যবসা কাশ্মীরের অন্যতম আয়ের উৎস। দীর্ঘদিন হইতে চলা বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি-জেহাদি আন্দোলনের ফলে কাশ্মীরের সেই পর্যটন শিল্প সংকটের সম্মুখীন হইয়াছিল। সাধারণ কাশ্মীরিদের জীবিকায় টান পড়িয়াছিল। ক্ষুব্ধ হইলেও জেহাদিদের উদ্যত বন্দুকের মুখে দাঁড়াইয়া তাহারা প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। আজ যখন কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং জঙ্গি জেহাদি বিচ্ছিন্নতাকামীরা অশনি সংকেত দেখিতেছে, তখন সাধারণ কাশ্মীরিরা আবার আশায় বুক বাঁধিয়াছে। তাহারা বুঝিতেছে, বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসানে আবার কাশ্মীরে পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটিবে। দেশি-বিদেশি পর্যটকরা আবার পা রাখিবেন কাশ্মীরের ভূমিতে। কাশ্মীরে আবার স্বর্ণযুগ ফিরিয়া আসিবে।

তেমনই আশায় বুক বাঁধিয়াছেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরাও। নব্বই দশকের গোড়াতেই পাকিস্তানপন্থী জঙ্গি জেহাদিরা কাশ্মীর হইতে বিতাড়ন করিয়াছিল এই হতভাগ্য কাশ্মীরি পণ্ডিতদের। প্রায় এক বস্ত্রে অসহায় অবস্থায় এই কাশ্মীরি পণ্ডিতরা আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন রাজধানী দিল্লি ও তাহার আশেপাশের অঞ্চলে। গত কয়েক দশকে সাতটি গণহত্যার শিকার হইতে হইয়াছিল ওই কাশ্মীর পণ্ডিতদের। তাহাদের পরিবারের নারীদের সম্ভ্রমহানি করা হইয়াছিল। অসহায় কাশ্মীরি পণ্ডিতরা কাহারো কাছে বিচার চাহিয়াও পান নাই। নীরবে তাহারা অশ্রুমোচন করিয়াছেন। নিজ ভূমে পরবাসীর মতো জীবন যাপন করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও, একদিনের জন্যও তাহারা জঙ্গিবাদের পথে অগ্রসর হন নাই। আজ এই কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বাস্তবিক অর্থেই নূতন আলোর দিশা দেখিতে পাইতেছেন। অশ্রুমোচন করিতে করিতে যে গৃহ একদিন তাহাদের ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, অচিরেই সেই গৃহে আবার তাহার প্রবেশ করিতে পারিবেন।

৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পর এক অন্য কাশ্মীরের রূপ ক্রমে প্রতিভাত হইতেছে। সুখী, সমৃদ্ধ, উজ্জ্বল এক কাশ্মীর। যে কাশ্মীরে বন্দুকবাজ বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পদচারণা করে না। যে কাশ্মীর মিলনের কাশ্মীর, ভারতের কাশ্মীর।

সুভাষিতম্

ন বিশ্বসেৎ অবিশ্বস্তে বিশ্বস্তেনাতিবিশ্বসেৎ।

বিশ্বাসাদ্ ভয়মুৎপন্নমপি মূলানি কৃন্তাতি।। (শান্তিপর্ব ১৩৮/১৪০)

অবিশ্বাসী লোককে বিশ্বাস করবে না, বিশ্বাসী লোককেও অতিবিশ্বাস করবে না। কারণ বিশ্বাস থেকে ভয় উৎপন্ন হলে তা মূল পর্যন্ত বিনষ্ট করে থাকে।

কমিউনিস্টদের শিক্ষা দীক্ষা ও শালীনতা-ভদ্রতা

বিশ্বামিত্র-র কলম

ভারতের কমিউনিস্টরা শিক্ষাদীক্ষা, শালীনতা-ভদ্রতার দিক দিয়ে চিরদিনই বেশ উচ্চমানের। রামকৃষ্ণদেবকে 'মৃগীরোগী' কিংবা নেতাজীকে 'তেজোর কুকুর' বলার মতো সর্বশ্রুত ঘটনায় তাঁরা নিজেদের বেশ উচ্চ রুচি তুলে ধরেছিলেন। তবে শুধু অতি বিখ্যাত বা দেশবাসীর শ্রদ্ধেয়, আদর্শস্থানীয় মানুষকে হেয় করতেই যে তাঁরা পটু তা নন, তুলনায় কম বিখ্যাত, অল্প পরিচিত মানুষজনের ক্ষেত্রেও কমিউনিস্টরা কদর্যতার পরিচয় দিয়েছে। কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষকে 'কানা অতুল' বলা বা নির্যাতিতা রমণীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা, সংসদকে 'শুয়োরের খোঁয়াড়' বলা--- ভারতের রাজনীতিকে নোংরা, কদর্য করে তুলতে কমিউনিস্টদের অবদান সত্যিই অতুলনীয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, কমিউনিস্টদের এই চরিত্র যে আমরা কেউ জানি না তেমনও নয়।

২০১৪-য় লোকসভা নির্বাচনের পর হঠাৎই এই নিম্নরুচির অধিকারীরা খুব 'সুরুচি সম্পন্ন', 'শিক্ষিত', 'ভদ্র', এমনকী 'সহিষ্ণু'ও হয়ে উঠলেন। যারা ভুক্তভোগী তাঁরা জানেন কমিউনিস্ট অভিধানে এই ধরনের শব্দ-বন্ধনের কোনও ঠাঁই নেই। আসলে তারা ভোলও পাল্টায়নি, মুখোশও পরেনি। এসবই ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় তৈরি হওয়া এক ধরনের প্রোপাগান্ডা। যে প্রোপাগান্ডাকে মানুষের মনে আরও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য অতিবাম পরিচালিত একটি দৈনিকের 'সম্পাদকীয় দপ্তরও চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি। কিন্তু এত 'শিক্ষিত' হরেক প্রজাতির কমিউনিস্টদের দেখেও 'অশিক্ষিত', 'গুটকাখোর', 'ভক্ত', এমনকী 'হিন্দু বাঙ্গালি' (জামাত বাঙ্গালির বিরোধী যারা আর কী!) পাবলিকও ভোটের বাজারে এদের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণার দৃষ্টিতে চাইলেন না। ফলে কমিউনিস্ট হাহাকার তীব্র বেগে নিনাদিত হলো ভারতবর্ষের পাহাড় থেকে সমুদ্র সর্বত্র— 'এ দেশে (ওটা ভাবতে হবে) জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম।' তো পদাঘাত-প্রাপ্ত কমিউনিস্টরা দ্রুত সেই 'পদাঘাতে'র ধাক্কা সামলাচ্ছেন। ধাক্কা সামলাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এতকাল ধরে সযত্নে প্রচারিত 'নম্র, ভদ্র, শিক্ষিত, সচ্চরিত্রে'র ইমেজ থেকে বেরিয়ে এসেছেন অকুতোভয়ে। দেশে রাজনৈতিকভাবে কমিউনিস্টদের যা হাল, তাতে 'পানি' পেতে পেতে পৃথিবী আর টিকবে কিনা সন্দেহ আছে। তাই সোশ্যাল মিডিয়াতে দাঁত-নখ বের করতেই আর আপত্তিটা বা কী! গত বছরের স্বাধীনতা দিবস থেকে এখনও অবধি রাজনৈতিক ভাবে বিজেপি তার সেরা সময়ে অবস্থান করলেও সময়টা খুব সুখের হয়তো নয়। গত বছর ১৬ আগস্ট অটলবিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যু দিয়ে শুরু। এবছর প্রথম মোদী সরকারের 'কিচেন ক্যাবিনেটে'র তিন সদস্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিপক্ষামন্ত্রী মনোহর পর্রিকর, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী অরুণ জেটলি একে একে অমৃতলোকের যাত্রী হয়েছেন। এই দুর্ভাগ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে আর কোনও রাজনৈতিক দলের হয়নি।

> **ঈশ্বর অবিশ্বাসী এই কালাপাহাড়ি 'ভদ্দরনোক' বিরোধীরা যদি শাহ-মোদীর মৃত্যুর জন্য মানতও করে তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এদের হত্যা-টত্যার যে স্বতন্ত্র 'ক্যালি' ছিল তাও সময়ের তালে শিকেয়, তাই 'অভিশাপের' চরণেই এদের মাথা নুইছে, কিন্তু শকুনের অভিশাপে কী আর গোরু মরে।**

প্রতিটি মৃত্যুর পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কমিউনিস্ট সুলভ উল্লাসের নোংরামি দেখা গিয়েছে। বাজপেয়ীর ক্ষেত্রে যাও বা রাজনৈতিক কমিউনিস্টরা প্রকাশ্য বিবৃতিতে অন্তত 'রাইট ম্যান ইন আ রং পার্টি' স্ট্যান্ড নেওয়ায় উল্লাসে লাগাম টানা গিয়েছিল, বাকি তিনজনের অকাল মৃত্যুর ক্ষেত্রে আর সেই রাশও টানা গেল না। বিশেষ করে সম্প্রতি অরুণ জেটলির মৃত্যু ঘিরে যে ইতরামির উৎসব পালন করেছে কমিউনিস্টরা তা দেখে যে কোনও শুভচিন্তক মানুষ আঁতকে উঠবেন। এক হিন্দু নামধারী বাংলাদেশের জামাত সমর্থক তথ্যচিত্র নির্মাতা ফেসবুক পোস্টে লেখেন : 'আমাকে দেশদ্রোহী বলুন আর যাই বলুন, অরুণ জেটলির মৃত্যুতে দুঃখিত হতে পারবো না।'

সার্বিক ভাবে কমিউনিস্টদের পোস্টগুলি ছিল নোটবন্দি নিয়ে, কারণ এতে এদের কালোটাকা বিশালভাবে ফেঁসে গিয়েছে। তবে জামাত-পন্থী, পিঠ বাঁচাতে তৃণমূলে আশ্রয় নেওয়া কমিউনিস্টরা আরও এককাঠি ওপরে। বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানীকেও 'লাইন'-এ রেখে মানবসভ্যতার মাথা খেয়ে নোংরামির চূড়ান্ত করতে আর কিছু বাকি রাখেনি। আসলে এই ধরনের কমিউনিস্টরা মোদী-শাহকে কোনওমতে কাবু করতে পারছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে অমিত শাহ এঁদের ঘেঁটি চেপে ধরছেন, ফলে ঈশ্বর অবিশ্বাসী এই কালাপাহাড়ি 'ভদ্দরনোক' বিরোধীরা যদি শাহ-মোদীর মৃত্যুর জন্য মানতও করে তাহলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। এদের হত্যা-টত্যার যে স্বতন্ত্র 'ক্যালি' ছিল তাও সময়ের তালে শিকেয়, তাই 'অভিশাপের' চরণেই এদের মাথা নুইছে, কিন্তু শকুনের অভিশাপে কী আর গোরু মরে। পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য প্রবাদ! ■

নুন ভাতে নাহি খেদ ডিম খেলে বাড়ে মেদ

প্রিয় স্কুল পড়ুয়ার দল,

তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় মেনু ডিম-ভাত। এটা তোমরা জান কিনা জানি না তবে গরিবগুর্বো ঘরের ছেলে-মেয়েরা এটা জেনে নাও স্কুলে গিয়ে ডিম-ভাত আর জুটবে না। খোদ মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন, নো ডিম। সয়াবিনেও পুষ্টি আছে।

সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, মাথা পিছু ৪ টাকা ৩১ পয়সা বরাদ্দে ডিম খাওয়ানো যায় না। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই নোটিশ জারি করে দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। এমনিতে যে কোনও নোটিশ জারি করতে দিনের পর দিন কেটে যায় কিন্তু খরচ কমাতে এই নোটিস দিনের দিন বেরিয়ে গেছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, রাজ্যের সব স্কুলে মিড ডে মিলে ডিম-মাছ খাওয়ানো যাবে না। বরাদ্দ টাকার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সব স্কুলকে এই গাইডলাইন মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আসল কারণটা শোন। সামনে দুর্গাপুজো। সব বারোয়ারিকে টাকা দিতে হবে, ক্লাবগুলোকে দিতে হবে। উৎসব, মোচ্ছব হবে। কার্নিভ্যাল হবে। তার পরে শীতে কত কত মেলা হবে, কত্ত কিছু। সেসবের জন্য তো খরচ আছে। তাই নো ডিম, নো মাছ। মাংসের তো গন্ধ শোঁকাও বারণ। স্রেফ ডাল-ভাত- তরকারি। যেদিন রান্না হবে না সেদিন নুন দিয়ে ফ্যানা ভাত।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বলেন, ‘‘এই যে সংবাদমাধ্যমে সব লিখে দিচ্ছে মিড ডে মিলে নাকি সাত দিনে সাত রকম পদ খাওয়ানো হবে? এগুলো কি ঠিক? আমি নিজেই জানি না আর ওরা লিখে দিচ্ছে?’’ মুখ্য সচিব মলয় দে-কে পাশে নিয়ে তিনি আরও বলেন, ‘‘মিড ডে মিলে আমরা ছাত্র-ছাত্রী পিছু ৪ টাকা ৩১ পয়সা পাই। তাই দিয়ে ডিম খাওয়াব কোথা থেকে? তাঁর কথায়, ‘‘৪ টাকা ৩১ পয়সায় ভালো করে ভাত-ডালই হয় না তো ডিম! তাও আমরা চালটা বিনামূল্যে দিই বলে! আমি বলছি, মিড ডে মিলে ভাত-ডাল আর একটা তরকারি পেট ভরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করুন।’’

তোমরা ছোটো হলেও একটা বিষয় জেনে রাখা ভালো। প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে মিড ডে মিলের জন্য যে খরচ হয় তা কিন্তু কোনও সরকার একা দেয় না। প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রপিছু ২ টাকা ৪৮ পয়সা দেয় কেন্দ্র সরকার। রাজ্য সরকার দেয় ১ টাকা ৬৫ পয়সা। উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের ছেলে-মেয়েদের জন্য মাথাপিছু ৩ টাকা ৭১ পয়সা দেয় কেন্দ্র, রাজ্য দেয় ২ টাকা ৪৭ পয়সা। এছাড়া পরিকাঠামো নির্মাণ, খাদ্য পণ্যের পরিবহণ, রাঁধুনির বেতন ইত্যাদি বাবদ অনুদান দেয় কেন্দ্রের সরকার। রাজ্য সরকার চাইলেই নিজেদের বরাদ্দ বাড়াতে পারে। অন্য কিছু হলে যখন টাকা পাওয়া যায় তবে এটাও পাওয়া যাবে না কেন! কেউ বিষ মদ খেয়ে টাকা পেতে পারে যদি তবে ভালো খাওয়ার জন্য টাকা মিলবে না কেন!

প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের মিড ডে মিল নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক শুরু হয়েছিল হুগলির বাণী মন্দির প্রাথমিক স্কুল থেকে। স্থানীয় সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় একদিন ওই স্কুলে গিয়ে দেখেন ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু নুন দিয়ে ভাত খাচ্ছে। তার পরই বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমে হই হই পড়ে যায়।

দু'দিন বাদে দেখা যায় হুগলির জেলা শাসক রত্নাকর রাও একটি প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ডিম দিয়ে ভাত খাচ্ছেন। তার পর শনিবার নোটিফিকেশন জারি করে রত্নাকর জানিয়ে দেন, হুগলি জেলায় মিড ডে মিলে মেনু বদলে যাচ্ছে। তাতে গোটা গোটা শব্দে লেখা ছিল সোম থেকে শনিবারের মেনু। এও বলা হয়েছিল, বুধবার মিড ডে মিলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাতে বড়বে মুরগির মাংস, বৃহস্পতিবার সেদ্ধ ডিম আর শনিবার ঝোলের ডিম।

ওই দিনই নোটিফিকেশন জারি করেছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলাও। জেলা শাসক পার্থ ঘোষের সই করা ওই বিজ্ঞপ্তিতেও ৬ দিনের মেনু স্পষ্ট জানানো হয়েছিল। সেই সঙ্গে পরিস্কার করে লেখা ছিল, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার মিড ডে মিলে ডিম বা মাছ খাওয়ানো হবে ছাত্র-ছত্রীদের।

কিন্তু তারপরে এ দিন স্কুল শিক্ষা দপ্তর জানিয়ে দিল, এই ধরনের কোনও নির্দেশিকায় নাকি জারি করা হয়নি। আগের নির্দেশিকা অনুসারেই খাওয়াতে হবে মিড ডে মিল।

সুতরাং, এখন থেকে এটাই হোক স্লোগান। নুন ভাতে নাহি খেদ, ডিম খেলে বাড়ে মেদ।

—সুন্দর মৌলিক

চীন পাকিস্তানের ভারত বিরোধী দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া

অতিথি কলম

ব্রহ্মা চেলানি

স্কুলের বদমায়েশ ছেলের মতো চীনেরও আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষ বন্ধুবান্ধব নেই। পূর্বতন প্রজারাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার (চীনের) ওপর আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে sanction চাপানোর পর কেবলমাত্র একটি ক্রমশ ধসে পড়া, দেনায় জর্জরিত পাকিস্তানই তার মিত্র হিসেবে টিকে আছে। যদিও দু'জনেরই অন্য দেশের ভূমি অধিকার করে নেওয়ার আগ্রাসী বাসনা ছাড়া কোনো মিল আদৌ নেই। চীন নিজের দেশে উইঘুর মুসলমানদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালালেও পাকিস্তান মুসলিম দেশ হিসেবে প্রতিবাদের বদলে চীনের পাশে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বৈরতান্ত্রিক দেশ চীন ও জিহাদি সন্ত্রাসবাদীদের লালন পালন করার জন্য সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত দেশ পাকিস্তানের এই সুবিধাবাদী বোঝাপড়ার মূলে রয়েছে ভারতকে যে কোনো ভাবে দাবিয়ে রাখার প্রয়াস।

অতি সম্প্রতি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চীন নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর নিয়ে একটা ঘরোয়া আলোচনা চালানোর পর রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে কোনো যৌথ বিবৃতির বদলে নিজেরাই মনমতো কিছু ঘোষণা করে দেয়। কাশ্মীর সমস্যাকে আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে আনার পাকিস্তানের মরিয়া চেষ্টাকে সাহায্য করতেই চীনের এই অপপ্রয়াস তা কিন্তু কারোরই বুঝতে বাকি নেই। খেয়াল রাখা দরকার পূর্বতন কাশ্মীর রাজ্যের অধীনস্থ ভূমির এক পঞ্চমাংশ এখন চীনের কবজায়। এছাড়া ১৯৬২-র আগ্রাসনের পর ভারতের সিয়াচীন অঞ্চলের ভূখণ্ডও তারা নিজেদের অধিকারে রেখেছে। পাকিস্তানও তাদের কারাকোরাম অঞ্চল ঘিরে বিস্তৃর্ণ অঞ্চল ভয়ে চীনকে দিয়ে দিয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে চীনের এই আচরণ প্রমাণ করেছে জম্মু-কাশ্মীরকে ঘিরে যেখানে ভারত, পাকিস্তান, চীন, তিব্বত, আফগানিস্তানের সীমানাগুলি বিভিন্নভাবে মিলিত হয়েছে সেগুলির ওপর অধিকার কায়েম রাখতেই চীন-পাকিস্তানের সখ্য আরও মজবুত করা হলো। ১৯৭৮ সালে খুলে দেওয়া পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে চীনের তৈরি কারাকোরাম হাইওয়ে এই মিলনের আরও একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই রাস্তা পাক অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের গিলগিট—বাল্টিস্থান হয়ে চীনে গেছে। এটিই চীন-পাক অর্থনৈতিক করিডর। পাক অধিকৃত জম্মু কাশ্মীর অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ সেনা মোতায়েন রাখার পরও ওই অঞ্চলে চালানো নিজেদের প্রকল্পগুলিকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিতে তারা আরও সামরিক প্রস্তুতি বাড়াচ্ছে। বস্তুত চীনের এই অর্থনৈতিক করিডোর পাকিস্তানের মধ্যে দিয়ে ভারত মহাসাগরে পৌঁছবার একটি ল্যান্ড করিডর ছাড়া কিছু নয়। ইরানে ভারতের যৌথ উদ্যোগে চলা 'ছবর বন্দরের' খুবই কাছে একটি সামরিক বন্দর তৈরির কৌশল করছে চীন যার প্রমাণ হিসেবে করাচীতে তারা ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

এই কাজকর্ম সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে ধীরে কিন্তু নিশ্চতভাবেই চীন পাকিস্তানকে নিজের উপনিবেশিক অঞ্চলে পরিণত করছে যাতে ভারতকে দাবিয়ে রাখা যায়। খেয়াল রাখবেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে পুলওয়ামায় ভারতের আধা সামরিক বাহিনীর কিছু জওয়ানের হত্যার পর আন্তর্জাতিক স্তরে এই হত্যার পেছনে প্রকাশ্য মদতকে ধিক্কার দিয়ে যখন সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে কড়া ব্যবস্থা নিতে পাকিস্তানের ওপর চাপ আসছিল তখনও চীন তাদের পাশেই দাঁড়ায়। দশ বছর ধরে চীন লাগাতার পাকিস্তানে বসবাসকারী সন্ত্রাসবাদী মাসুদ আজাহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে। যখন আর কিছুতেই এই জঘন্য সন্ত্রাসীর পক্ষ অবলম্বন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে তখনই থামতে বাধ্য হয়। আজও চীন আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার সদস্য হিসেবে ভারতের যোগদানে তীব্র আপত্তি জানিয়ে রেখেছে। তাদের আবদার হলো সন্ত্রাসীদের আঁতুড়ঘর পাকিস্তানকেও এই সদস্যপদ দিতে হবে।

বাস্তবে চীন দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিরুদ্ধে এই কাশ্মীরকার্ড খেলে চলেছে। ২০১০ সাল থেকে চীন হঠাৎ জম্মু-কাশ্মীরের নাগরিকদের চীন যাওয়ার

> ভারত যেহেতু আন্তর্জাতিক স্তরে চীন যে আসলে ভারতেরই অন্তর্গত জম্মু-কাশ্মীরের পাক অধিকৃত অঞ্চল বেআইনিভাবে দখল করে আছে এই বিষয় উত্থাপনে নিতান্তই উদাসীন, তারই ফলশ্রুতিতে কাশ্মীর সমস্যার ক্ষেত্রে চীন নিরপেক্ষতার ছলনা করে নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ক্ষেত্রে Stapled Visa দেওয়া শুরু করে। অন্যদিকে ভারতের জম্মু-কাশ্মীরকে বিবাদিত অঞ্চল দাবি করে নর্দার্ন কমান্ডের অধিকর্তাকে তারা ভিসা দিতে অস্বীকার করে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করার সূত্রেই তাঁর সফরের আয়োজন করা হয়েছিল। সরকারিভাবেও চীন ভারতের সঙ্গে চিহ্নিত সীমানা নিজের অধিকারে থাকা জম্মু-কাশ্মীরের অংশ (পাকিস্তান চীনকে দিয়ে দিয়েছে অধিকৃত অঞ্চল থেকে) বাড়িয়ে নিয়েছে। এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ একবার বলেছিলেন ভারতের দুর্বল অঞ্চল জম্মু-কাশ্মীরের ওপর চীনের লোলুপ দৃষ্টি রয়েছে।

বাস্তবে জম্মু-কাশ্মীর তিনটি বিভিন্ন দেশের সীমান্ত লাগোয়া হলেও একমাত্র ভারতই তার অংশে থাকা কাশ্মীরে বিশেষ সুবিধে দেওয়া, আঞ্চলিক সরকারের ওপর বাড়তি ক্ষমতা, সুযোগ নেওয়া বলবৎ রেখেছিল। কিন্তু ভারত যদি জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার সাংবিধানিক ব্যবস্থা খারিজ নাও করত তাতেও চীনের পাকিস্তানের দু'দিক দিয়ে ভারতকে ঘিরে ধরার কৌশলে কোনো খামতি পড়ত না। ভারতকে নজরবন্দি করে রাখার সুবিধের জন্যই চীন ভারতে সন্ত্রাসীদের দিয়ে ছায়াযুদ্ধ চালানোকে মদত দেয়। নিজের দেশে চীন ১০ লক্ষেরও বেশি মুসলমানকে মগজধোলাই করে তাদের মাথা থেকে জেহাদি সন্ত্রাসের ভাবনা দূরীকরণে ব্যস্ত রয়েছে। বস্তুত চীনও পাকিস্তানের ছকেই ভারতের সঙ্গে একটি চাপা যুদ্ধের আবহ তৈরি করে রেখেছে। লাদাক ও অন্যান্য অঞ্চলে নীরবে ভূখণ্ড দখল করে রাখা তারই প্রমাণ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করে সরকার সেখানে চীনের এই আগ্রাসী পরিকল্পনার, বেআইনি সীমানা লঙ্ঘনের মোকাবিলায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পথ সুগম করল। একইভাবে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সংবিধানের উপযুক্ত সংশোধন এনে উপত্যকাকে বিচ্ছিন্ন করার ফলে পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সীমানা বিরোধের নতুন সমাধানের চেষ্টাও শুরু হতে পারে। জম্মু-কাশ্মীরের দু'দিক দিয়েই ভারতকে চীনের সম্মুখীন হতে হয়। একটি লাদাখ অঞ্চলে, অন্যটি পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে তাদের সেনার উপস্থিতির কারণে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতকে একটা বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে। তা হলো, সজাগ থাকা আর গুটিয়ে থাকা। বোঝা খুবই সহজ যে প্রথমটি অবলম্বন করলে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা বা তাকে এড়ানো যাবে। আর দ্বিতীয় অবস্থানটি আরও নতুন সমস্যাকে ডেকে আনবে। দেশের ওপর অন্যান্য চাপ সৃষ্টি হবে। চীন কিন্তু নির্লজ্জের মতো জম্মু-কাশ্মীরে ভারতের তথাকথিত মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে সোচ্চার। সদা ভারতকে একপক্ষীয় অবস্থান নেওয়ায় অভিযুক্ত করে আন্তর্জাতিক স্তরে দুর্নাম করার লাগাতার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে ভারত দীর্ঘযুগ ধরে চলা তিব্বতের বাসিন্দাদের ওপর চীনের অত্যাচার সম্পর্কে নীরব। নীরব জিনজিয়াং প্রদেশে ঘেটো তৈরি করে মুসলমানদের ওপর নৃশংস নির্যাতনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা সম্পর্কে বা সদ্য ঘটে চলা হংকং-এর মানবাধিকার ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়ার চীনের কীর্তির প্রচারে। ভারত যেহেতু আন্তর্জাতিক স্তরে চীন যে আসলে ভারতেরই অন্তর্গত জম্মু-কাশ্মীরের পাক অধিকৃত অঞ্চল বেআইনিভাবে দখল করে আছে এই বিষয় উত্থাপনে নিতান্তই উদাসীন, তারই ফলশ্রুতিতে কাশ্মীর সমস্যার ক্ষেত্রে চীন নিরপেক্ষতার ছলনা করে নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারাও কিন্তু এই বিতর্কিত অঞ্চলের অন্যতম খেলোয়াড়। ভারত নিদেন পক্ষে চিনের পরোক্ষ সমালোচনাতেও অনীহা দেখিয়েছে। অন্তত আমাদের তো এটা বলা উচিত যে কাঁচের ঘরে বসে অন্যকে ঢিল ছোঁড়া উচিত নয়। এর থেকেও মর্মান্তিক হচ্ছে বিগত ক'বছরে ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চীন তার অংশীদারী দ্বিগুণ করে ফেলেছে। তাঁদের আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানিই ফুলেফেঁপে উঠেছে। এই বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ টাকার অঙ্কে ভারতের সামগ্রিক প্রতিরক্ষা খরচকে ছাড়িয়ে গেছে। এর মাধ্যমে একটা জিনিসই পরিষ্কার গাছেরও খাব তলারও কুড়বো। ভারতকে কিন্তু তার সঠিক রাস্তা খুঁজে নিতেই হবে। অন্যথায় এই আগুন ওগরানো ড্রাগন আরও ভয়ংকর কোনো মতলব করতে জোর পেয়ে যাবে।

(লেখক বিশিষ্ট সংবাদ ভাষ্যকার)

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন
আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

রম্যরচনা

বুদ্ধিজীবীদের দাবি

● সবার সমান অধিকার চাই

কিন্তু ইউনিয়ন সিভিল কোর্ট করা যাবে না। করলে সাম্প্রদায়িক বলে ধরা হবে।

● সব মানুষ সমান। জাতপাত দূর করতে হবে

কিন্তু সংরক্ষণ বন্ধ করা যাবে না। করলে দলিত বিরোধী ধরা হবে।

● কাশ্মীর সমস্যার সমাধান চাই

কিন্তু স্থায়ী সমাধানের জন্য কোনো কাজ করা যাবে না। করলে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে ধরা হবে।

● দুর্নীতিমুক্ত দেশ চাই

কিন্তু দুর্নীতির জন্য কোনো নেতাকে গ্রেপ্তার করা যাবে না। গ্রেপ্তার করলে গণতন্ত্রের ওপর আঘাত বলে ধরা হবে।

● নারী সশক্তিকরণ করতে হবে

কিন্তু তিনতালাক বিরোধী আইন পাশ করানো যাবে না। করলে সংখ্যালঘুদের ধর্মে আঘাত দেওয়া হবে।

উবাচ

❝ অরুণ জেটলির প্রয়াণে আমি শোকাহত। তিনি দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। একজন বুদ্ধিদীপ্ত আইনজীবী ও অভিজ্ঞ সাংসদ ছিলেন তিনি। দেশ গঠনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। ❞

রামনাথ কোবিন্দ
ভারতের রাষ্ট্রপতি

বিজেপি নেতা অরুণ জেটলির প্রয়াণে।

❝ এবছর আমরা বাপুজীর ১৫০ বর্ষ উদ্‌যাপন করছি। এই উপলক্ষ্যে আমরা প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে একটা বিপ্লব শুরু করব। ❞

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে।

❝ পশ্চিমবঙ্গ সরকার গিমিকে চলছে। চাপে পড়েই নয়া খাদ্যতালিকা। নিজেদের দোষ ঢাকতে কেন্দ্রের অসহযোগিতা বলছে। সহযোগিতা চাইলে সরাসরি আসুন। ❞

দেবশ্রী চৌধুরী
কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী

মিড ডে মিল কলেঙ্কারিতে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে কটাক্ষ

❝ বিশ্ব আর্থিক মন্দার মোকাবিলায় কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগ ভালো। সরকার বেশ কিছু আর্থিক সংস্কারও ঘোষণা করেছে। তবে এটুকুই পর্যাপ্ত নয়, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে আরও বড়ো উদ্যোগ নিতে হবে। ❞

মায়াবতী
বিএসপি সুপ্রিমো

বিশ্ব আর্থিক মন্দা প্রসঙ্গে

বিশ্ব বিমুখ পাকিস্তানের পাশে শুধু ভারতীয় ‘সমব্যথীরা’

সাধন কুমার পাল

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের পদক্ষেপ দেশে বিদেশে এত ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে যে তাবড় তাবড় বিশ্লেষকরাও হিসেব মেলাতে পারছেন না। যারা মনে করছেন কেন্দ্রীয় সরকার তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তারাও এই পদক্ষেপের পিছনে দলমত নির্বিশেষে সমর্থনের বহর দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে এই পরিবেশ যে একদিনে তৈরি হয়নি তা বুঝতে হলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের দিকে নজর ঘোরাতে হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিত্য শাখায় মূলত বালক শিশুদের জন্য যে সমস্ত খেলা হয় তার মধ্যে একটি নাম ‘কাশ্মীর কিসকা’। খেলাটি আসলে মাটিতে চিহ্নিত করা গোড়ালি রাখার মতো একটি ছোটো জায়গা দখলের লড়াই। খেলা চলার সময় ধ্বনি ওঠে ‘কাশ্মীর কিসকা’ তার জবাবে সবাই চিৎকার করে বলে ‘হামারা’। খেলাটি সাহস ও সরাসরি চ্যালেঞ্জের খেলা। যার বাহুবল ও কৌশল বেশি খেলা শেষে সেই জয়ী হয়।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেও সঙ্ঘের শাখায় এই খেলাটি খেলতে দেখেছি। শাখার মাঠে কেন এই ধরনের খেলা হতো ছেলেবেলায় এটা না বুঝলেও কাশ্মীরকে যে আমাদের মুক্ত করতে হবে এই অনুভূতিটুকু হতো। কাশ্মীরকে ৩৭০ ধারার কবল থেকে মুক্ত করে এলাকাটিকে দেশের মূলস্রোতের সাথে মেলানো সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কাছে নিত্য সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। অনেকটা যেন ইজরায়েলিদের নিজের মাতৃভূমি ফিরে পাওয়ার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ‘Next year in Jerusalem’ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মতো। ৩৭০ ধারা বাতিলের পক্ষে সংসদে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে বক্তব্য রাখার সময় অমিত শাহের শরীরী ভাষায় আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা দেখে মনে হচ্ছিল উনিও হয়তো বালক অবস্থায় দিনের পর দিন সঙ্ঘের শাখার মাঠে ‘কাশ্মীর কিসকা’ খেলেছেন এবং চ্যাম্পিয়নও হয়েছেন অনেকবার। কাশ্মীর নিয়ে এই আবেগ বুঝতে হলে জীবনের অন্তিম লগ্নে ৩৭০ ধারার রাহুগ্রাস মুক্ত কশ্মীর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে সুষমা স্বরাজের সর্বশেষ টুইটে চোখ রাখতে হবে যাতে তিনি লিখেছেন, ‘Thank you Prime Minister. Thank you very much. I was waiting to see this day in my life’। মনে রাখতে হবে কাশ্মীর নিয়ে ভারতবাসীর এই আবেগের সঙ্গে কাশ্মীরবাসীর আত্মপরিচয় রক্ষার আবেগের সংঘাত কম নেই। কারণ ৩৭০ ধারা নামক বিশেষ সুবিধার আড়ালে এতদিন যা হচ্ছিল সেটা কাশ্মীরের প্রকৃত পরিচয় মুছে দিয়ে এলাকাটিকে ইসলামিক জেহাদের পৃষ্ঠভূমি হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যক্ষ লড়াই। ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে এই জনসমর্থন যে বছরের পর বছর ধরে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সাধনার ফসল তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও টিভিতে একটি বিতর্কসভায় যোগদান করে পেশায় একজন সাংবাদিক, রাজনীতিক ও ভূতত্ত্ববিদ মুশাহিদ হুসেন জানান, ভারতে অনেক বিরোধিতার মাঝেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখিকা অরুন্ধতী রায়, রাজনৈতিক দল কংগ্রেস পাকিস্তানের ‘সমব্যথী’। এই পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের অবস্থার কীভাবে উন্নতি হবে তা জানতে চওয়া হলে মুশাহিদ হুসেন জানান, “ভারত অনেক বড়ো একটি দেশ আর সেই দেশে সবাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সমর্থন করেন না।”

> **সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে এটা বলতেই হবে যে আগামীদিনে দেশ হিসেবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে। ভারতের মধ্যে থাকা পাকিস্তানের ‘সমব্যাথী’দের অস্তিত্ব বিলোপের দায়িত্ব যে ভারতের দেশপ্রেমিক আমজনতাকেই নিতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।**

তিনি তাঁর বক্তব্যে আরও জানান, “কাশ্মীরের বিষয়টিকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে ও শক্ত হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। এটা একটা লম্বা যুদ্ধ। ভারত অনেক বড়ো দেশ। ভারতে অনেক মানুষই আছেন যারা পাকিস্তানের জন্য সমব্যথী। যেমন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখিকা অরুন্ধতী রায়, রাজনৈতিক দল কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টি ও দলিত পার্টি। গোটা ভারতবর্ষ মোটেও মোদীর সঙ্গে নেই।” একজন পাকিস্তানি পাকিস্তানের টিভি চ্যানেলে বসে ভারতের যে সমস্ত ব্যক্তি ও দলকে পাকিস্তানের ‘সমব্যথী’ বলে উল্লেখ করেছেন তারা কিন্তু কেউ এই লেখা শেষ করা পর্যন্ত এই বক্তব্য খণ্ডন করেনি।

বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তান সম্পূর্ণ একা। পাকিস্তানের আবেদনের উত্তরে রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্পষ্ট করে দিয়েছে দ্বিপাক্ষিক বিষয় হিসেবে কাশ্মীর ইস্যু ভারতের সঙ্গে কথা বলেই মিটিয়ে নিতে হবে। রাশিয়া, আমেরিকা, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া-সহ ইসলামিক দেশগুলির কেউ পাকিস্তানের পাশে নেই। এই সমস্ত দেশ মনে করে কাশ্মীরে ভারত যা করেছে তা ভারতীয় সংবিধান মেনেই করেছে। সমস্ত বিশ্বে পাকিস্তানের পাশে যে কেউ নেই একথা ওই দেশের বিদেশমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেই জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে পকিস্তানের একমাত্র সহায় ভারতের সেই সমস্ত দল ও ব্যক্তি যাদের পাকিস্তানের টিভি চ্যানেলে মুশাহিদ হুসেন পাকিস্তানের ‘সমব্যথী’ বলে চিহ্নিত করেছেন।

পাকিস্তানের ‘সমব্যথী’ বলে চিহ্নিত এই সমস্ত দল ও ব্যক্তি বর্গের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাদের উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরের মানুষের উপর অত্যাচার করছে, দমন পীড়ন চালাচ্ছে এই অভিযোগ তুলে

হইচই করে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের প্রমাণ দেওয়া। এ যেন এক অদ্ভুত সমাপতন দেশের ভেতরে বাইরে পাকিস্তানের মুখরক্ষা ও ভারতে পাকিস্তানের 'সমব্যথী'দের মুখরক্ষার উপায় একটিই, 'যে ভাবেই হোক এটা প্রমাণ করা যে ভারতের তরফে কাশ্মীরের মানুষের ওপর দমন পীড়ন হচ্ছে'। কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী লোকসভায় দাঁড়িয়ে যখন কাশ্মীর ইস্যুকে 'রাষ্ট্রসঙ্ঘের পর্যবেক্ষণাধীন' বলে মন্তব্য করলেন তখন রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী সংসদে উপস্থিত থেকেও এটি কংগ্রেস দলের বক্তব্য নয় বলে প্রতিবাদ করেননি। কিংবা অধীররঞ্জন যখন কাশ্মীরের পরিস্থিতিকে হিটলারের নাজি ক্যাম্পের সঙ্গে তুলনা করলেন গান্ধী পরিবার তারও প্রতিবাদ করেনি। বিবিসি, আলজাজিরার মতো কিছু বিদেশি মিডিয়ার ভারত বিরোধী অ্যাজেন্ডার অঙ্গ হিসেবে প্রচারিত কিছু রিপোর্ট ও পাকিস্তানের আনা কল্পিত অত্যাচার ও তার জেরে মানুষের মৃত্যুর অভিযোগের উপর ভিত্তি করে রাহুল গান্ধী ভারত সরকার ও দেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কাশ্মীর নিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের দাবি করেছেন। এতে এটাও প্রমাণ হয় যে রাহুল গান্ধী দেশের মিডিয়া ও প্রশাসনের উপর ভরসা করেন না। এর জবাবে কাশ্মীরের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে রাহুল গান্ধীকে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ দিতে বলেছেন। এই বিষয়ে রাজ্যপালের বক্তব্য স্পষ্ট, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর যে কাশ্মীরে কোনো গুলি ও লাঠি চলেনি, সেখানে অত্যাচার ও মৃত্যুর প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে।

জম্মু-কাশ্মীরে প্রশাসনিক কড়াকড়ি শিথিল করা নিয়ে কোনও রায় দেয়নি সুপ্রিম কোর্ট। কোনও কিছুই রাতারাতি করা যাবে না। উপত্যকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সরকারকে সময় দিতে হবে, জম্মু-কাশ্মীর মামলায় এমনই পর্যবেক্ষণ দেশের সর্বোচ্চ আদালতের। উল্লেখ্য, ৩৭০ ধারা বাতিলের পর থেকেই কার্যত নিরাপত্তার ঘেরাটোপে মুড়ে রাখা হয়েছে ভূস্বর্গকে। যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত থমকে রয়েছে উপত্যকায়। এই প্রেক্ষিতে দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন সমাজকর্মী তেহসিন পুনাওয়ালা। সেই মামলার শুনানিতেই গত ১৩ আগস্ট মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট এই বক্তব্য জারি করেছে।

মঙ্গলবার আদালতে অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপাল বলেন, ২০১৬ সালের জুলাই মাসে বুরহান ওয়ানির মৃত্যুর পর উপত্যকার পরিস্থিতির শিক্ষা নিয়েই এবার এত কড়াকড়ি করা হয়েছে। তিনি আশ্বাসের সুরে বলেন, কয়েকদিনের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হবে। সবটাই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। এজি এও জানান যে, সরকার নিয়মিত গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে। এখনও পর্যন্ত উপত্যকায় কোনও প্রাণহানি হয়নি।

ইতিমধ্যে মঞ্চে হাজির হয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও সেই বক্তব্য রাখলেন যা পাকিস্তান শুনতে চাইছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেছেন কেন্দ্র সরকার কাশ্মীরে যা করেছেন তা দেশের সংবিধান বিরোধী। রাহুল প্রিয়াঙ্কা যাই বলুন না কেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ হরিয়ানার দীপেন্দ্র হুদার মতো অনেক কংগ্রেস নেতা কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নেওয়া পদক্ষেপকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। ৭০ বছর বয়সি কংগ্রেসের দাপুটে নেতা জনার্দন দ্বিবেদীর দাবি, 'ইতিহাসের ভুল এতদিনে ঠিক করা হলো'। তিনি আরও বলেন, 'আমি কোনো পার্টির অবস্থান নিয়ে বলব না। তবে সাধারণ মানুষ হিসেবে আমার গুরুঃ রামমনোহর লোহিয়াও ৩৭০ ধারার বিরুদ্ধে বলতেন। আমার ব্যক্তিগত মত হলো, এটা জাতীয় সন্তুষ্টির বিষয়।'

এটা স্পষ্ট করে বলা যায় যে গান্ধী পরিবার কাশ্মীর ইস্যুতে শুধু দেশের আমজনতা নয় নিজের দল থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের সময়ও রাহুল গান্ধী রাফাল ইস্যুতে, 'চৌকিদার চোর হ্যায়' স্লোগানের ইস্যুতে যে নিজের দল ও আমজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন নির্বাচনের ফলে তা প্রমাণ হয়ে গেছে। রাহুল গান্ধী নিজে আমেথি থেকে পরাজিত হয়েছেন, কংগ্রেস সাকুল্যে ৫২টি আসনে জয়ী, অবশেষে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগও করতে হয়েছে রাজীব তনয়কে।

রাজনীতি করতে হলে পাকিস্তান নয় ভারতের ভোটারদের কাছে নিজেদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ দিতে হবে, এই দেওয়াল লিখন কংগ্রেসের যে নেতারা পড়তে পেরেছেন একমাত্র তারাই বোধহয় কাশ্মীর ইস্যুতে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কাশ্মীর ইস্যুতে বিশ্বমঞ্চে সম্পূর্ণ একা পাকিস্তানের একমাত্র ভরসা ভারতের পাক সমব্যথীরা। ভারতের এই সমস্ত নেতানেত্রী ও দলের বক্তব্যকে হাতিয়ার করে কোণঠাসা পাকিস্তান ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। কাশ্মীর নিয়ে সিপিএমের মুখপত্র গণশক্তির হেডলাইন দেখলে মনে হবে কাগজটি পাকিস্তানে ভারত বিরোধী ডেরায় ছাপা হচ্ছে। গত ১৫ আগস্ট গণশক্তির একটি খবরের হেডলাইন, 'মাঝরাতে শিশুদেরও তুলে নিয়ে যাচ্ছে জওয়ানরা'। এই খবরে লেখা হয়েছে, 'কাশ্মীরে মাঝরাতে বিছানা থেকে শিশুদেরও তুলে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। থানায় নিয়ে মারধর করা হচ্ছে। মহিলাদের অভিযোগ, শ্লীলতাহানি করা হচ্ছে। কাশ্মীর উপত্যকায় ঘুরে এসে এই রিপোর্ট করল তথ্যানুসন্ধানী দল। এই দলের সদস্যরা জানালেন, কাশ্মীরে সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। ৩৭০ ধারা খারিজ এবং যে পদ্ধতিতে তা খারিজ করা হয়েছে তা নিয়ে মানুষ ভয়ংকর ক্ষুব্ধ। এই ক্ষোভ দমন করতে গিয়ে সরকার কাশ্মীরে দমন পীড়ন চালাচ্ছে। গোটা কাশ্মীরই কার্যত কারফিউ কবলিত হয়ে রয়েছে'।

সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও বালাকোটে বিমান হানার প্রমাণ চেয়ে এর আগেও এই 'সমব্যথীরা' পাকিস্তানকে সহায়তা করেছেন। এবার স্বাধীনতা দিবসে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বালাকোট এয়ার স্ট্রাইকের কথা নিজে মুখে স্বীকার করার পর রাহুল মমতা, বামপন্থী নেতা-নেত্রীরা এখন মিথ্যাচারের জন্য, ভারতীয় সেনাকে অপমান করার জন্য মানুষের কাছে ক্ষমা না চেয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছে। হতে পারে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে, রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টিও সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পাকিস্তানের 'সমব্যথী' তকমার সাহায্যে ঘুরে দাঁড়ানোর খোয়াব দেখছেন। সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে এটা বলতেই হবে যে আগামীদিনে দেশ হিসেবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে। ভারতের মধ্যে থাকা পাকিস্তানের 'সমব্যথী'দের অস্তিত্ব বিলোপের দায়িত্ব যে ভারতের দেশপ্রেমিক আমজনতাকেই নিতে হবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ■

রাজনীতির কারণেই ভারতে জাতপাতের রমরমা

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

দেবীলাল

মুলায়ম

মায়াবতী

জাতপাতের সমস্যাটা ভারতের নিজস্ব ব্যাপার— সম্ভবত আর কোথাও এটা নেই। এর দ্বারা দেশের মানুষকে সামাজিক দিক থেকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে। এসেছে উঁচু-নীচুর ভেদাভেদের মানসিকতাও। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই জন্মের দ্বারাই ব্যক্তির জীবিকা নির্দিষ্ট হয়েছে। নির্ধারিত হয়েছে তাঁর সামাজিক অবস্থান।

আর্যযুগের মাঝামাঝি সময় এই বর্ণবিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল। বিদ্বান ব্যক্তিরা 'ব্রাহ্মণ' বলে পরিচিত হতেন— তাঁরা বিদ্যাদান ও পৌরোহিত্য নিয়ে থাকতেন। শারীরিক বলশালীরা দেশচালনা ও শান্তিরক্ষার কাজ করতেন— তাঁরা ছিলেন 'ক্ষত্রিয়'। 'বৈশ্যরা' ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। আর 'শূদ্রদের' কাজ ছিল সবারই কাজ করা। ঐতিহাসিক ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরীর ভাষায়— 'This division of classes was simply a division of labour'— (হিস্ট্রি অব এন্সিয়েন্ট ইন্ডিয়া, পৃ. ৮৩)। কিন্তু এতে ভেদাভেদের ধারণাও ক্রমে প্রকট হয়ে উঠেছিল। বলা হয়েছে— ব্রাহ্মণরা এসেছেন ঈশ্বরের মুখ, ক্ষত্রিয়রা বাহু, 'বৈশ্যরা' উরু এবং 'শূদ্ররা' পদযুগল থেকে। তবে প্রথম দিকে ঘৃণা বিদ্বেষের স্থান ছিল না— বিভিন্ন জাতের মধ্যে যোগাযোগ, বিবাহ, বন্ধুত্ব ইত্যাদি হতো। ড. মজুমদার, ড. রায় চৌধুরী ও ড. দত্তের মতে, 'There was hardly any taboo in intermarriage, change of occupation or commensability'— (অ্যান্ অ্যাডভান্সড্ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৩)।

কিন্তু পরে তাতে এসেছে সঙ্কীর্ণতা গোঁড়ামি, উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ। তাছাড়া প্রত্যেকটা বর্ণেও এসেছে অসংখ্য উপ-বিভাগ— এমনকী, জন্ম নিয়েছে অস্পৃশ্যতার তত্ত্বও। তার ফলে তথাকথিত নীচু বর্ণের মানুষ ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার শিকার হয়েছেন অন্যায়ভাবে। এতে বিরাট বাধা এসেছে জাতীয় ঐক্য ও মানবিকতার ক্ষেত্রেও। কিন্তু আরও বেশি ক্ষতি হয়েছে জাতপাতের বিষয়টা রাজনীতির সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে। এটা ঠিক— শিক্ষার বিস্তার, নগরায়ণ, পাশাপাশি অবস্থান, কর্মগত সান্নিধ্য ইত্যাদি বিষয় এখন এই ভেদাভেদকে কিছুটা দূর করেছে। কিন্তু রাজনীতি জাতপাতের মানসিকতার সঙ্গে মিশে যাওয়ার ফলে নির্বাচনের বিষয়টাও কলুষিত হয়ে গেছে। দেখা যাচ্ছে— বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যেমন কেরলে নায়ার, লাদার ও রেড্ডীয়ার তামিলনাড়ুতে; লিঙ্গয়েৎ ও এক্কালিঙ্গা কর্ণাটকে; পতিদার ও আন্নাভালাম গুজরাটে; এবং জাঠ ও রাজপুতরা উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো— বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নির্বাচনী সাফল্যের জন্য প্রভাবশালী জাতের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তার ফলে জাতপাত এখন রাজনীতির একটা অপরিহার্য উপাদান হয়ে গেছে। প্রার্থী নির্বাচন, নির্বাচনী প্রচার ইত্যাদি ব্যাপারে প্রায় সব দলই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জাতপাতের বিশ্লেষণ সতর্কভাবে করে। আর অধিকাংশ ভোটারই রাজনৈতিক তত্ত্ব, অর্থনৈতিক কর্মসূচি, প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ইত্যাদিকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে নিজ নিজ জাতের প্রার্থীকেই বেছে নেন। বলা বাহুল্য, অনেকের ক্ষেত্রেই এই বর্ণ-আবেগ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই জাতপাত এখন রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে।

জি. রাজন অবশ্য মনে করেন, এই ভাবাবেগটা গ্রামাঞ্চলেই বেশি— অন্যত্র এটা ততটা

প্রকট নয়— (ডেমোক্র্যাসি অ্যান্ড ইকনমিক চেঞ্জ, পৃ. ৭৪)। কিন্তু বাস্তবের কথা হলো— কম হলেও এটা শহরের উচ্চাঙ্গ মহলে অনেকটা আছে— কারণ আবেগটা প্রাচীন এবং বংশানুক্রমিক। তাই সহদেব গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, 'Feeling of casteism is as strong as the religious sentiment'— (ইন্ডিয়ান কন্স্টিটিউশান, পৃ. ২২২)।

তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে দুই দলের নির্বাচনী লড়াই কার্যত দুই জাতের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। ড. এস. এল. সিক্রি লিখেছেন, 'caste is evident everywhere and all levels of electoral process– the selection of candidates, compaign, voting, behaviour and the formation of ministries'— (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স)। অনেক সময় দেখা গেছে— একটা জাতের বহু মানুষ একসঙ্গে বুঝে গেছেন তাঁদের জাতের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য। রাজনীতির তত্ত্ব বা জাতীয় স্বার্থ তাঁদের কাছে বড়ো কথা নয়— প্রধান বিষয় হলো মনোনীত প্রার্থীর সাফল্য। সেই জন্য ডব্লিউ. এইচ. মরিস জোন্স্ মন্তব্য করেছেন, 'Politics is more important to castes and castes are more important to politics than ever before'— (গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স ইন্ ইন্ডিয়া)

প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জন্ স্টুয়ার্ট মিল্ মন্তব্য করেছেন— 'universal education must precede universal adult franchise'--- অর্থাৎ সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করার আগে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। তা না হলে রাজনৈতিক সচেতনতা, স্বচ্ছ চিন্তা, ও বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব ইত্যাদি কারণে ভোটের অপব্যবহার হতে পারে। শিক্ষার বিস্তার না ঘটলে নির্বাচনী আচরণে বর্ণ, ধর্ম, আঞ্চলিকতা, ভাষা, ব্যক্তিপূজা, অর্থলোভ, ক্ষুদ্র স্বার্থ ইত্যাদি আবেগ প্রাধান্য পায়। এই কারণে ব্রিটেনে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ধাপে ধাপে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করা হয়েছে। আমাদের দেশে ব্যাপারটা হয়েছে উল্টো— শিক্ষা বিস্তারের আগেই রাতারাতি সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তার ফলে অনেক সময় সুষ্ঠু নির্বাচন হয় না— বিভিন্ন ধরনের আবেগ, উন্মাদনা, লাভ লোকসানের খতিয়ান নির্বাচনী আচরণকে প্রভাবিত করে।

জাতপাত তেমনই একটা পুরনো ও অলৌকিক আবেগ। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে এটা রয়ে গেছে এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা এটাকে তাঁদের সুবিধাবাদী রাজনীতিতে কাজে লাগান। রজনী কোঠারী তাই মন্তব্য করেছেন, 'Caste has been unduly politicised'— (কাস্ট্ ইন দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্স)। বিশেষ করে বিহার, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যে এর প্রভাব পড়েছে বেশি করে। এম. এন. শ্রীনিবাস তাই মন্তব্য করেছেন, 'Nowa-days, all political parties put up candidates belonging to the locally preponderant castes'— (কাস্ট্স্ ইন্ মডার্ন ইন্ডিয়া)। এটা অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নয়।

নেতারা বোঝেন দুটো কথা— ক্ষমতা পাওয়া এবং ক্ষমতা ধরে রাখা। সুতরাং তাঁদের অনেকের কাছেই জাতপাত একটা মহা মূল্যবান নির্বাচনী সামগ্রী। সেই জন্য ড. সিক্রি লিখেছেন, 'caste-factors are still very important voting deferminants'— ঐ, পৃ. ১১২)।

এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, আমাদের অনেক নেতাই এই জাতপাতের রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়--- জগজীবন রাম তপশিলি বলে তপশিলি-অধ্যুষিত এলাকায় বরাবর দাঁড়িয়ে সাফল্য পেয়েছেন। হরিয়ানার দেবীলাল কয়েকটা বর্ণের মানুষকে একত্রিত করে 'অজগর' ও 'সোলাঙ্কী' গঠন করেছিলেন নির্বাচনী সাফল্যের জন্য। এই ভাবেই গড়ে উঠেছে জাতভিত্তিক রাজনীতির প্রাধান্য। অনেক ক্ষেত্রে আবার জাতপাতের ভিত্তিতেই রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে— যেমন ডি. এম. কে., এ. আই. ডি. এম. কে. ইত্যাদি। আর বহু রাজনৈতিক দলই নির্বাচনে জয় লাভের জন্য বিশেষ বিশেষ জাতের ওপর নির্ভর করে। যেমন অনেকে তামিলনাডুতে ফরোয়ার্ড ব্লক্‌কে 'মেজর পার্টি' বলেন, অন্ধ্রের রেড্ডীদের অনেকেই কংগ্রেস অনুরাগী। অনেক জাতই নিজেদের স্বার্থে বিশেষ বিশেষ দলের সঙ্গী হয়ে যায়। এভাবেই জাত-ভিত্তিক রাজনীতির সৃষ্টি হয়েছে।

ড. হরিহর দাস মন্তব্য করেছন, তাৎপর্যের বিষয় হলো— যদিও রাজনৈতিক দলগুলো জাতভিত্তিক রাজনীতিকে প্রকাশ্যে নিন্দা করে, তারা কিন্তু এটাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে— 'yet they give top– mosts priority to the casteism in politics'— (ইন্ডিয়া : ডেমোক্র্যাটিক গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃ. ৩৯৬)। এভাবেই জাতপাত আমাদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।
ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

বাংলা ভাষার ইসলামিকরণের ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ

সৌভিক রাতুল বসু

যদি শুধু বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বাঙ্গালি আইডেন্টিটি রক্ষা করার জন্য পূর্ব আর পশ্চিম পাকিস্তানের আদর্শগত লড়াই হতো তাহলে বাংলাদেশ আজ আর একটি আরবিস্থান হওয়ার দৌড়ে পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিত না।

এই আশঙ্কা অনেক আগে করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) বিরোধিতা প্রসঙ্গে তাঁর 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন— 'যখন বঙ্গবিভাগের বিভীষিকায় আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়েছিল তখন আমাদের ভয়ের একটি প্রধান কারণ ছিল এই যে, এটা রাজনৈতিক ভূগোলের ভাগ নয়, ভাষার ভাগকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলার পূর্ব-পশ্চিম একটি চিত্তের ভাগ হইবে।'

প্রথমদিকে না হলেও পরে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হয়েছিল। যদিও রবীন্দ্রযুগে অনেক মুসলমান কবি সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে সমৃদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তান জন্মের পর থেকে তো বটেই এবং নবগঠিত বাংলাদেশেও তাঁদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের বা আরও ভালো করে বললে হিন্দু বাঙ্গালি সাহিত্যিকদের লেখা বর্জনের পক্ষে ছিলেন। হবিবুল্লাহ বাহার, শ্যামসুন্নাহার মাহমুদ থেকে সংগীত শিল্পী ওস্তাদ আয়েত আলি খান, ফুলঝুরি খান— রবীন্দ্ররচনা থেকে রবীন্দ্রসংগীত বর্জনের পক্ষে ছিলেন সবাই।

বাংলা ভাষার ইসলামিকরণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৪ সালের ২৭ মার্চ (১১ চৈত্র ১৩৪০) রবীন্দ্রনাথ, এম এ আজানকে এক পত্রে লেখেন— 'বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার পার্সি আরবি শব্দ চলে এসেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের কোনো লক্ষণ নেই। কিন্তু যেসব পার্সি, আরবি শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো এক শ্রেণীর মধ্যেই বদ্ধ, তাকে বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে পদক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে সেটি বেখাপ্পা হয় না, বাংলায় সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলেনি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল'।

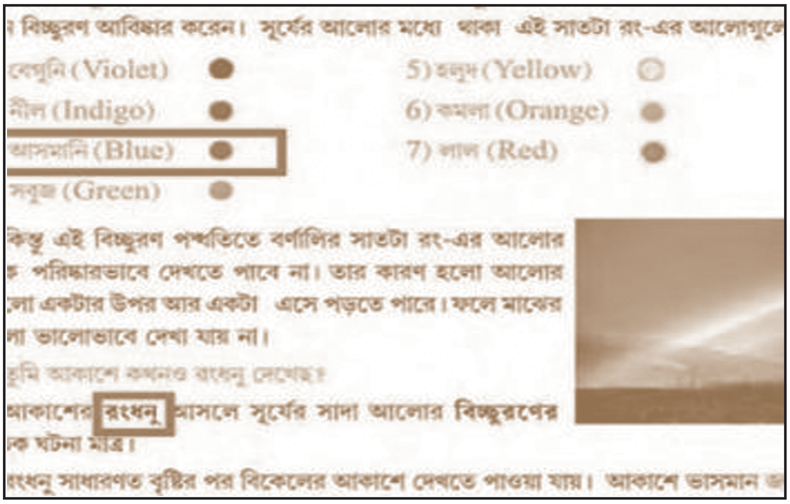

ন বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। সূর্যের আলোর মধ্যে থাকা এই সাতটা রং-এর আলোগুলে

বেগুনি (Violet)
নীল (Indigo)
আসমানি (Blue)
সবুজ (Green)
5) হলুদ (Yellow)
6) কমলা (Orange)
7) লাল (Red)

কিন্তু এই বিচ্ছুরণ পদ্ধতিতে বর্ণালির সাতটা রং-এর আলোর ক পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে না। তার কারণ হলো আলোর লো একটার উপর আর একটা এসে পড়তে পারে। ফলে মাঝের লা ভালোভাবে দেখা যায় না।

তুমি আকাশে কখনও রংধনু দেখেছ?

আকাশের রংধনু আসলে সূর্যের সাদা আলোর বিচ্ছুরণের ক ঘটনা মাত্র।

রংধনু সাধারণত বৃষ্টির পর বিকেলের আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। আকাশে ভাসমান জ

১৯৩৬ সাল মুসলিম লিগের বয়স তখন তিরিশ পূর্ণ হয়েছে। মৌলানা আক্রাম খান তখন যৌবনের মধ্যগগনে। তিনি মুসলমান নবজাগরণের বার্তা প্রকাশ করছিলেন তাঁর সম্পাদিত 'মোহাম্মদী' পত্রিকায়। এই পত্রিকা তখন শিক্ষিত মুসলমানদের ঘরে ঘরে। রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণী' ও 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতা দুটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। এর প্রতিবাদ স্বরূপ মৌলানা আক্রাম খান 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ (মে-জুন, ১৯৩৬) সংখ্যাটি বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যারূপে প্রকাশ করে সেই কবিতা দুটির তীব্র সমালোচনা করে লেখেন --- ''স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলির এক বিরাট অংশ পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, নরপূজার, জড়পূজার, প্রকৃতি-পূজার কুশিক্ষায় এবং আদিম যুগের অসভ্য মানুষের পৌরাণিক অন্ধ-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মহিমা প্রচারে। অন্যদিকে মুসলমানকে নিতান্ত হেয়, নিতান্ত নগণ্য, এমনকী একটা নিতান্ত জঘন্য জাতিরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্যও ওই সমস্ত পাঠ্য ও ইতিহাস পুস্তকে নীচতা ও নিষ্ঠুরতার পরকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।"

এই মৌলানা আক্রাম খান দেশভাগ অবধি কলকাতায় ছিলেন, তারপর ঢাকায় গিয়ে দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হয়েছিলেন । দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকাও সবসময় সরব ছিল রবীন্দ্র নিন্দায়। পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথকে নিষিদ্ধ করার পিছনে 'আজাদ' পত্রিকা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গনও অধিকার করেছিল। ১৯৪২ সালে মুসলমান চিন্তাবিদদের জন্য যথাক্রমে কলকাতা ও ঢাকায় গড়ে উঠেছিল পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি এবং পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ।

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রেনেসাঁ সোসাইটির প্রথম অধিবেশনে আবুল মনসুর আহমেদ বলেন--- (১) ''রাজনীতির বিচারে পাকিস্তানের অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যিকের কাছে তার অর্থ তমুদ্দনী আজাদি, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচারাল অটোনমি।

(২) একথা মানি যে, হিন্দুর সংস্কৃতিতে ও মুসলমানের তমুদ্দনের মধ্যে ১০১টি মিল রয়েছে। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে তাদের মধ্যে গরমিলও আছে প্রচুর।

(৩) ধর্ম ও সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তমুদ্দন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সেই সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পয়দায়েশ ও সমৃদ্ধি।

(৪) পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ ও অসমের সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুব উন্নত সাহিত্য। তবুও এ সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাঙ্গলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ সাহিত্য থেকে মুসলমান সমাজ কোনো প্রেরণা পায়নি এবং পাচ্ছে না, এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে, এই সাহিত্যের স্রষ্টাও মুসলমান নয়। এর বিষয়বস্তু মুসলমানি নয়, এর স্পিরিটও মুসলমানি নয়, এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।

(৫) বস্তুত, বাঙ্গলার মুসলমানের যেমন একটি নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটি নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানি বাঙ্গলা সাহিত্য বা পুঁথি সাহিত্য। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মুখের ভাষায়, হিন্দুর ভাষায় নয়। সে ভাষা সংস্কৃত বা তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণের তোয়াক্কা করে না। বাংলা ভাষায় কথা বলতে গেলেই হরফের কথাও এসে পড়ে। আমি শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে বাংলার বর্তমান বর্ণমালার আবর্জনা আমরা রাখবনা না।"

ওই একই সমাবেশে আবুল কালাম শামসুদ্দিন বলেন--- ''এতে অনাবশ্যক অক্ষর বাংলা বর্ণমালায় ভিড় করে আছে। সংস্কৃত ভাষার প্রতি অতিরিক্ত মোহবশত স্বভাবতই রক্ষণশীল হিন্দু সাহিত্যিকদের এ ব্যাপারে কুণ্ঠা হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু মুলমান সাহিত্যিক জানেন বাংলা ভাষা একটি মিশ্র ভাষা— সংস্কৃতের সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। শুধু তাই নয়, পরোক্ষ যোগও অত্যন্ত ক্ষীণ। কাজেই অনাবশ্যক অক্ষরের মোহ তার থাকতে পারে না।"

মনসুর আহমেদ কিংবা শামসুদ্দিন সাহেবের বক্তব্য কিন্তু শুধু রেনেসাঁ সোসাইটির কথা ছিল না, তা ছিল আপামর পাকিস্তানপন্থী শিক্ষিত বাঙ্গালি মুসলমানদের মানস চেতনা। মনসুর আহমেদ শুধু খ্যাতনামা সাংবাদিক-সাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি স্বাধীনোত্তর পাকিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভূমিকাও পালন করেছিলেন। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রবর্জন আন্দোলনে অন্যতম প্রধান ভূমিকাও পালন করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিতাড়িত হয়ে আসা অধিকাংশ কমিউনিস্টদের একসময়কার নয়নের মণি ছিলেন কবি গোলাম মোস্তাফা। তা এহেন ভদ্রলোক ১৯৫০ সালে লিখেছেন— ''Not only Bengali Literture even the Bengali alphabet is full of idolatry. Each Bengali letter is associated with this or that God or Goddess of Hindu Pantheon. The Arabic language and the script must be the best language and the best script in the world.

১৯৬০ সালে গোলাম মোস্তাফা আবার লিখলেন— ''উর্দু ও বাংলা যে আজ এত প্রগতিশীল ও জীবন্ত তাহার কারণ যে উহারা আর্যভাষা নহে। অন্যকথায় সংস্কৃত হইতে উহাদের জন্ম হয় নাই। সংস্কৃত হইতে যে ভাষা যত দূর রহিয়াছে, সে ভাষা আজ তত জীবন্ত, তত প্রগতিশীল।'

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পরেও এই প্রবণতা কমার বদলে উত্তরোত্তর বেড়েছে। 'আমার সোনার বাংলা'কে জাতীয় সংগীত হিসেবে বর্জনের প্রথম দাবি উঠেছিল ৭ মার্চ, ১৯৭৬ সালে সোহরাবর্দি উদ্যানের জনসমাগমে যার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জিয়াউর রহমানের ঘনিষ্ঠ সামরিক আইন প্রশাসক বিমান বাহিনী প্রধান এম. জি. তাওয়াব। আর এই ট্র্যাডিশন বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক প্রবক্তা বলে পরিচিত খোন্দকার আব্দুল হামিদের বক্তব্য শুনলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়। তিনি বলেছেন--- ''রাজবাড়ি বহর' নামে একটি জায়গা আছে, যেখানে পদ্মা ও মেঘনা মিশেছে কিন্তু এক দেহে লীন হয় নাই। হাজারো বছর পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও না। মেঘনার পানি কিচকিচা কালো। পদ্মার পানি সাদা ঘোলাটে। এপার বাঙ্গলা ওপার বাঙ্গলার মধ্যে তেমনি চিরন্তন তফাত। সে তফাত রঙের, খুনের, মানসের, আবেগের, অনুভূতির, ধর্মের, কর্মের, এবাদত-বন্দেগির, নামের, নিশানের, ঐতিহ্যের, উত্তরাধিকারের, খোরাকের, পোশাকের, আদাবের, লেহাজের, কায়দা-কানুনের, জীবনবোধের, জীবনধারার, জীবন-দর্শনের এবং জীবন-সাধনার। হৃদয়ানুভূতির নিবিড় বন্ধন দুয়ের মধ্যে চিরকাল অবর্তমান। এমনকী উভয় বাঙ্গলার ভাষা মূলত একটা হলেও বড়োলোকের বৈঠকখানা, বিদগ্ধদের সাহিত্য অঙ্গনের বাইরে জনগণের যে ভাষা তা যবানে-লিসানে-মুখরেজে-তালাফফুজে পর্যন্ত আলাদা।'

ওপরে আব্দুল হামিদ যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তা পাকিস্তান যুগে বাংলা ভাষার ইসলামিকরণের কথা মনে করিয়ে দেয়। আসলে খোন্দকার আব্দুল হামিদের 'বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী' দর্শনের নমুনা ছড়িয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের সর্বত্র যার নাম এককথায় আরবিকরণ।

ওপার বাঙ্গলায় বাংলাভাষার আরবিকরণ দীর্ঘকাল ধরে শুরু হলেও এপার বাঙ্গলায় তার ছাপ পড়েনি এতকাল--- সুচারুভাবে এই প্রচেষ্টা শুরু হলো ২০১১ সালে তৃণমূল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে— রামধনুকে রংধনু বা আকাশিকে আশমানি শব্দ হিসেবে সরকারি পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার করা আসলে এক সুবিশাল চক্রান্তের অংশমাত্র বা হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

আমাদের নিজেদেরই সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে কোনো অবস্থাতেই আমাদের সাধের বাংলা ভাষা উর্দু, পার্সি বা আরবির গহ্বরে তলিয়ে না যায়, আমরা যেন আমাদের গৌরবময় অতীত এবং শক্তিসাধনার উত্তরাধিকার ভুলে ইসলামের পদতলে আত্মসম্মান খুইয়ে না বসে সত্যিকারের বাঙ্গালি হয়ে উঠতে পারি। ■

মতামত

মোদীর কাছে চিরঋণী থাকবেন মুসলমান মহিলারা

রণিতা সরকার

বিগত কয়েক দশকের সবচেয়ে ঐতিহাসিক জয় তিন তালাক বিরোধী বিল পাশ। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা মধ্যযুগীয় বর্বরতার হাত থেকে মুক্তি পেতে চলেছেন মুসলমান মা-বোনেরা। এই জয় শুধু তাদের নয়, এই জয় হলো আধুনিক সভ্যতার। আমরা এখন সেই সময়ে দাঁড়িয়ে আছি যখন ইসরোর পাঠানো চন্দ্রযান-২ চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে, তাই এই জয় শুধু যে সময়ের অপেক্ষা ছিল তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও যদি ধর্মের বেড়াজালের অজুহাত দিয়ে মেয়েদের যদি প্রতি পদক্ষেপে সমঝোতায় চলতে হয় তাহলে বলা যায় আমরা নামেই কেবল স্বাধীন— ভেতরটা চরম কট্টর শুধু তাই নয়, অন্ধকারে ভরা যেখানে আলোর লেশ মাত্র নেই। এই চরম আধুনিকতার আলোর ঝলকানিতে শায়রা বানো, ইসরত জাহানের কথা যাদের ভেতরের সুপ্ত মানবসত্তাকে জাগরিত করে এই জয় তাদের।

তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিরোধী আইনের তাৎপর্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করার জন্য আলোকপাত করতেই হয় ভারতীয় সংবিধানের প্রতি। সেখানে উল্লেখিত Article-14-এ সুস্পষ্টভাবে নারী- পুরুষের সমানাধিকারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু মুশকিল হলো ইসলামিক বৈবাহিক ব্যবস্থায় নারীর স্বাভিমান ও অধিকার কোনোটারই স্থান নেই। সেখানে পুরুষরাই সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন এবং নারীকে সেখানে বিচার করা হয় ভোগ্যপণ্যের মতো। এখানেই শুধু এই অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেমে থাকেনি, ইসলাম ধর্মাবলম্বী পুরুষেরা যেমন অগণিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে, ঠিক তেমনই অগণিত বিবাহ বিচ্ছেদও করতে পারেন। এটিই নাকি তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে উল্লেখিত ধর্মীয় উপদেশ! তবে সান্ত্বনা পুরস্কারবশত তারা বিবাহের সময় নারীর অনুমতি নেয় বা বলা যায় সামান্য করুণা করে কিন্তু বিচ্ছেদের সময় সেই চিরাচরিত অভ্যাসে বলীয়ান হয়ে পুরুষ তার পেশি প্রদর্শন করেন। এই Whatsapp, facebook, E-mail-এর যুগে শুধুমাত্র একটা mail করে বা খুব বেশি একটা ফোন করে তার সমস্ত দায়িত্ব, কর্তব্য থেকে অব্যহতি চেয়ে তালাক দিয়ে দেয় সেই নারীকে যে একদিন তার ঘরণি ছিল। তারপর সেই পুরুষ আবার মেতে ওঠেন পরবর্তী বৈবাহিক লীলায়। কারণ ধর্মীয় গ্রন্থের নির্দেশ তো সে মানতে বাধ্য! আর সেই সদ্য তালাক পাওয়া অসহায় নারীটি চার-পাঁচটি সন্তান-সহ নিক্ষিপ্ত হয় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে। স্থান, সময়, প্রেক্ষাপট হয়তো পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই বৈবাহিক চক্রে কোনও ছেদ পড়েনি। নারীকে তারা 'উর্বর কর্ষণযোগ্য' চাষের জমি ছাড়া আর কিছু ভাবে না। তাই ধর্মের অছিলায় এই নারীকে তারা বারবার ব্যবহার করবে এবং স্বার্থ মিটলে ছুঁড়ে ফেলবে।

বিশ্বের প্রায় ২২টি দেশ, যার মধ্যে ইসলামিক দেশ বলে পরিচিত কয়েকটি দেশ কুয়েত ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব আইন পাশ করে তাৎক্ষণিক তিন তালাক রদ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসাবে ভারতেরই এই পদক্ষেপ নিতে বেগ পেতে হলো। যেখানে কোটি কোটি মুসলমান মহিলা এই আইনের দ্বারা উপকৃত হবে সেখানে এই চিন্তাভাবনা আরও আগে থেকে করা উচিত ছিল। কিন্তু এখন যারা বিরোধীর আসন আলোকিত করে বসে আছেন, তাদের ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির সৌজন্যেই ভারতীয় সমাজ আজ আরও বিশ বছর পিছিয়ে গেছে। কংগ্রেস দলটি প্রায় নিজেরাই দায়িত্ব নিয়েছিল এই বিল খারিজ করে দেওয়ার। ওসব এখন অতীত, তারা এখন গ্যালারির দর্শক। বর্তমান ভারত সরকারের এই সদর্থক ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও ভোটে এই বিল পাশ হলো। অসহায়, সম্বলহীন, রিক্ত, তালাকপ্রাপ্ত মহিলাটির অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকটি সেইসব মোল্লা মৌলবিদের চোখে পড়েনি, যারা শুধুমাত্র ধর্মের ধ্বজা হাতে নিয়ে পুরোদস্তুর আইন বিরোধী কাজটি করে যাচ্ছেন। ইসরত জাহান, শায়রা বানো তো শুধু এক-দুটি উদাহরণ। ঘরে-ঘরে এরকম লক্ষ লক্ষ ইসরত খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সমাজ ও লৌকিকতার ভয়ে তাদের জনসমক্ষে আসা হয়ে ওঠে না।

আধুনিক, শিক্ষিত, উন্নত চিন্তার অধিকারী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান সমাজ সাদরে এই তাৎক্ষণিক তিন তালাক বিরোধী আইনকে গ্রহণ করেছেন। গ্রহণ করেছেন এই কারণে তাদের চোখে ধর্মের কালো ঠুলি পরানো নেই, তাঁরা স্বীকার করেন সমাজে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা। নারী জগৎশক্তির আধার, তাই যোগ্য সম্মান তাদের দিতেই হবে, এই ধারনায় তাঁরা বিশ্বাসী। সতীদাহ প্রথা রদ থেকে শুরু করে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ এবং বর্তমানে মুসলমান মহিলাদের এই বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য তিন তালাক বিরোধী আইন–- ভারত ভূখণ্ডে যতবার নারীদের উপর কদর্য আঘাত আঘাত নেমে আসবে তার সমাধানও অবশ্যম্ভাবী।

পুরুষ যতই তার পেশির আস্ফালন দেখান— তার স্থানও কিন্তু একদিন সেই মাতৃগর্ভই ছিল— এই নিগূঢ় বাস্তব সত্যটি, মোল্লা-মৌলবিরা উপেক্ষা করলেই তা মিথ্যা হয়ে যায় না। ঐতিহাসিক এই জয়ের খবর মুসলমান মহিলাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মনির্ভরতা তৈরি হয়েছে। এই জয়ের কাণ্ডারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে তারা ভোলেননি। কোটি কোটি মুসলমান মা-বোনের কথা যে তিনি ভোলেননি, শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করাই যে তাঁর উদ্দেশ্য নয় মোদী আবার তা আক্ষরিক অর্থেই প্রমাণ করলেন। ■

শেখ হাসিনার সরকারের পেছনে মূল রাজনৈতিক শক্তি কি হেফাজতে ইসলাম?

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ বাংলাদেশের শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী অকপটে স্বীকার করেছেন, যাদের পেছনে বেশি রাজনৈতিক শক্তি কাজ করে, সরকার তাদের কথা বিবেচনা করতে বাধ্য। সম্প্রতি বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের এক আলোচনা সভায় ২০১৭ সালে উগ্রবাদী ইসলামি সংগঠন হেফাজতে ইসলামের নির্দেশে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই থেকে হিন্দু ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমান লেখকদের কবিতা ও গদ্য রচনা বাদ দেওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মন্ত্রী সরকারের ওপর মৌলবাদী এই সংগঠনের চাপের কথা তুলে ধরেন। হেফাজতে ইসলামের সুপারিশে (পড়ুন নির্দেশে) ২০১৭ সালে যখন সরকার হিন্দু ও অসাম্প্রদায়িক মুসলমান লেখকদের রচনা বাদ দেন, তখন মহিবুল হাসান মন্ত্রীসভায় ছিলেন না। তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন এক কালের কট্টর বামনেতা, নব্য আওয়ামি লিগ নেতা নুরুল ইসলাম নাহিদ। হেফাজত সরকারের কাছে তালিকা পেশ করে বলেছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলাদেশের হৃদয়', ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের 'আমার সন্তান', জ্ঞানদাসের 'সুখেরও লাগিয়া', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাঁকোটা দুলছে', সত্যেন সেনের 'লাল গরুটা', সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ ভ্রমণ কাহিনি', রণেশ দাশগুপ্তের 'মাল্যদান', কাজি নজরুল ইসলামের 'বাঙালির বাংলা', এস ওয়াজেদ আলির 'রাঁচি ভ্রমণ', বাউল লালন সাঁইয়ের 'সময় গেলে সাধন হবে না', জসিমউদ্দিনের 'দেশ', হুমায়ুন আজাদের 'বই', গোলাম মোস্তাফার 'প্রার্থনা', সানাউল হকের 'সভা', রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর 'খতিয়ান' সহ আরও কয়েকটি লেখা বাদ দিতে হবে। পাঠ্যবইয়ের এক বিরাট অংশ ছাপা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু হেফাজতে ইসলামের 'নির্দেশ' মান্য করে সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে সেই বইগুলো ধ্বংস করা হয়, ছাপা হয় নতুন পাঠ্যবই। হেফাজতে ইসলামের তালিকা অনুযায়ী এই লেখাগুলো বাদ দেওয়া হয়, যুক্ত হয় হেফাজতের নির্দেশিত নতুন ইসলামি ভাবধারার লেখা। এক বিরাট ক্ষতি স্বীকার করতে হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। তিন মন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ধমক খেয়েছেন।

শাসক আওয়ামি লিগ নেতারা অভিযোগ করে আসছিলেন, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিএনপি-জামায়াত ও এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ক্ষমতায় থেকে দেশকে

মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিপরীত অবস্থানে নিয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিএনপি-জামায়াত ও জাতীয় পার্টি দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা কালে পাঠ্যবইয়ে হাত দেয়নি। পাঠ্যবইয়ে 'ইসলামের হাত' পড়লো মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে।

শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরেছেন, তিনি চট্টগ্রামের আওয়ামি লিগ নেতা ও তিনবারের নির্বাচিত মেয়র প্রয়াত মহিউদ্দিন চৌধুরীর ছেলে। তিনি রাজনীতির অতো মারপ্যাঁচ হয়তো বোঝেননি। স্বীকার করে নিয়েছেন, তত্ত্বগত সুপারিশগুলির বাস্তবায়ন করতে গেলে যে ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রয়োজন হয়, সেই পরিস্থিতিটা আমরা এনে দিতে পারছি না। প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারছে। তাদের শক্তি আমাদের চাইতে বেশি।

আওয়ামি লিগ দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল, জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৫৭টি আসন (সংরক্ষিত মহিলা আসন বাদে) তাদের দখলে। প্রশাসন, বিচার বিভাগ, সশস্ত্র বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী চলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ আওয়ামি লিগ সরকারের নির্দেশে। বলা যায়, প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টিও সরকারের দখলে। বিএনপি- জামায়াতকে গত দশ বছর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনার কণ্ঠ অত্যন্ত ক্ষীণ। অথচ মহিবুলের কথায় পরিষ্কার হলো আওয়ামি লিগ নয়, ক্ষমতার মূল শক্তি হেফাজতে ইসলাম। আওয়ামি লিগ সরকার ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতি ও ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করলেও বাস্তবায়িত করতে পারেনি। ইসলামবিরোধী আখ্যা দিয়ে হেফজত মাঠে নামে। ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজত রাজধানী অচল করে দিয়েছিল। আওয়ামি লিগ তখন এই হেফাজত বিএনপি-জামায়াত ও জাতীয় পার্টির মদতে সরকার ফেলে দেওয়ার আন্দোলনে নামে বলে অভিযোগ করেছিল। কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল হেফাজতের বিরুদ্ধে। সেই হেফাজত কালক্রমে মজবুত 'রাজনৈতিক শক্তি'র অবস্থান নিয়ে আওয়ামি লিগের ঘনিষ্ঠ মিত্রে পরিণত হয়। জামায়াতে ইসলাম বিএনপিকে দিয়ে যা করাতে পারেনি, হেফাজত আওয়ামি লিগকে দিয়ে তা করিয়ে নিচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের সামনে স্থাপিত নান্দনিক ভাস্কর্য সরানো হয়েছে, বিমানবন্দরের প্রবেশ পথে নির্মিত ভাস্কর্য ভেঙে দেওয়া হয়েছে। যে কওমি মাদ্রাসাগুলোতে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না (রচয়িতা হিন্দু বলে), জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না, সেই মাদ্রাসার ডিগ্রি সরকারের স্বীকৃতি পেয়েছে। এই 'রাজনৈতিক শক্তি'-র আগামী অ্যাজেন্ডা কী শতভাগ ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আওয়ামি লিগকে সামনে রেখেই? ■

চিঠিপত্র

তসলিমা ভারতেই থাকুন

কয়েকদিন পূর্বে সংবাদে পড়লাম বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের এদেশে থাকার এক বছরের ভিসা মঞ্জুর হলো। অথচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছিলেন ৫০ বছরের ভিসা দিবেন। তসলিমা দেবী একজন বাংলাদেশি মুসলমান লেখিকা। কিন্তু তিনি সেদেশের ধর্মান্ধ মৌলবাদী মুসলমান নেতাদের অত্যাচার ও অনাচারের কথা বলেছেন। এবং সেদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (মূলত হিন্দু) উপর অসহনীয় অত্যাচারের বর্ণনা লজ্জা উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন। এ কারণেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। নারী-পুরুষের বৈষ্যমের কথা বলেছেন, এক্ষেত্রে নিজের পরিবারকেও রেয়াত করেননি। এটা অবশ্য আমাদের দেশেও বর্তমান। বাংলাদেশ হতে বহু হিন্দু নিরাপত্তার কারণে এদেশে চলে এসেছেন। এদের মধ্যে সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী আছেন, কিন্তু কতজন সেই অত্যাচারের কথা লেখেন বা বলেন, বর্তমানে আপনাদের হিন্দু প্রতিবেশীরা কেমন আছেন খোঁজ রাখেন? সংকীর্ণ স্বার্থের জন্য, নিরপেক্ষতার ভণ্ডামি করে এদেশে সংখ্যালঘু তোষণে মেতে আছেন। সরকারি ও রাজনৈতিক সুবিধা পেতে, বাংলাদেশে নিজের লেখা বই বিক্রির জন্য আগের কথা ভুলে গেছেন। এই রাজ্যটি যদি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মতো হয়, এরাই আগে পলায়ন করবে এবং সেখানে গিয়ে এরূপ ভণ্ডামি করবে। কারণ চাটুকারিতা এদের পেশা। যে নিজের দেশ ও প্রতিবেশীদের প্রতি দরদী নয়, সে কোনো দেশকে আপন করতে পারবে না। অথচ তসলিমা নাসরিন নিজের দেশে না থাকতে পারার যন্ত্রণা ও হতাশা অনেক সময় প্রকাশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের বহু সাদৃশ থাকায় তিনি এ রাজ্যে থাকতেই বেশি ভালোবাসেন। আমার অনুরোধ এ রাজ্যের কোনো সাংসদ কেন্দ্রীয়মন্ত্রকে সুপারিশ করে তাঁর এদেশে স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টা করুন। তসলিমাদেবীর মতো স্পষ্টবাদী ও মানবদরদি ব্যক্তি থাকা দেশের পক্ষে মঙ্গল।

—সঞ্জয় দত্ত,
নবাবপুর, হুগলী।

পাকিস্তানের যুদ্ধের হুমকি কতটা বাস্তব

পাকিস্তান কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রতিশোধ নিতে সীমান্তে মিসাইল, মর্টার, যুদ্ধবিমান ইত্যাদির জোগান দিতে শুরু করেছে। ভারতকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়াই ওদের মূল উদ্দেশ্য। সেই জন্য পাকিস্তান থর এক্সপ্রেস, সমঝোতা এক্সপ্রে বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকী ভারত থেকে রাষ্ট্রদূতকে ফিরিয়ে নিচ্ছে এবং ভারতের রাষ্ট্রদূতকেও ফিরিয়ে নিতে বলেছে। সমস্ত প্রকার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। ভাবছে এতে ভারতের প্রভূত ক্ষতি হবে। এদিকে নিজের দেশে টমেটো পেঁয়াজ আরও কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া। এরপরেও কি বলে দিতে হবে আখেরে কার ক্ষতি কতটুকু এটা অবশ্য কারো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে পুরোটাই পাকিস্তানের লোক দেখানি নাটক বাজি। এইটুকুতেই এই অবস্থা কিছুটা যুদ্ধ হলে তো ওদের ভিক্ষায় বের হতে হবে। নিশ্চয়ই ভারতকে টক্কর দিতে গিয়ে পাকিস্তানিরা ঘাস খেয়ে থাকবে না। এদিকে ভারতের কাছে ইমরান খানের মুখোশ ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। আবার সে কাশ্মীরিদের কাছে দরদ না দেখালে ওরা ভাববে বিপদের সময় পাকিস্তান কিছুই করলো না। ইমরান খানের এখন, 'শ্যাম রাখি না কুল রাখি' অবস্থা। ইমরান খানের মঞ্চেও আসতে হবে কিন্তু ডায়লগ মুখস্থ না থাকায় বলতে হবে 'এসেছি যখন ফিরে যাওয়াই শ্রেয়'। পাকিস্তানের অত মুরোদ এখনো হয়নি যে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

তিনে অ্যালার্জি

বাঙ্গালির ঘরে একটা চলতি কথা আছে যে সাধারণভাবে 'তিন' সংখ্যাকে সকলে পরিহার করে চলে। কারণ ওই সংখ্যা নাকি অপয়া। গাড়ি করে দূরে কোথাও খাওয়া, কোনো শুভ কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে মোটকথা সকলেরই প্রায় ও তিনটিকে এড়িয়ে চলে কুসংস্কারের ভয়ে। অথচ দেখা যায় এই তিন ধর্মীয় ব্যাপার অতীব শুভ। ধর্মীয় ব্যাপারে বার বার ওই সংখ্যাটি ব্যবহার করা হয়। পাঠক হয়তো এখনও ভাবতে পারছেন না এই প্রতিবেদনটির কী অর্থ?

তাহলে বলি আমরা তিন তেরো আর তেইশ সংখ্যাকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলি। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে আবার আমরা তিন সংখ্যাটিকে আঁকড়ে ধরি যেমন পুরোহিতরা তিনবার আচমন করে, আমরা পুষ্পাঞ্জলি দিই তিনবার । আমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্মীয় ব্যাপারে তিন সংখ্যাটি খুব ভালো ভাবে ব্যবহার করা হয়।

কিন্তু কাকতালীয় ভাবে এই তিন সংখ্যাটি মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ৭২ বছর পর তিন সংখ্যাটি অ্যালার্জির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। কারণ ভারতে বসবাসকারী পাকিস্তানিরা কী ভাবতে পেরেছিল বহু বছর ধরে চলতে থাকা তিন তালাকের প্রথা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে? এবার আসছি আর একটি অ্যালার্জি সংখ্যার কথা। ভারতে বসবাসকারী কাশ্মীরিদের ভারতীয়দের থেকে আলাদা আইন, ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক সুবিধা পাওয়ার যে ধারা এতদিন বলবৎ ছিল সেই তিনশো সত্তর ধারার বিলোপ সাধন হলো এবং অ্যালার্জির কারণ হয়ে দাঁড়ালো সেই প্রথম সংখ্যা তিন এবং কাকতালীয় ভাবে একই সঙ্গে ৩৫এ যার প্রথম সংখ্যাটিও তিন সেটারও বিলোপ সাধন হলো। আমরা বলতাম কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভুল বলতাম। ওই কথাটি আজ ৩৭০/৩৫এ ধারা বিলোপের ফলে গলাবাজি করে বলছি

কাশ্মীর ভারতের এবং এবারই প্রথম কাশ্মীরে, স্বাধীনতার পর, তেরঙ্গা পতাকা উড়বে। সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ!

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী।

অবশেষে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি হলো সম্পূর্ণ

অবশেষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ ৭ দশক পরে কাশ্মীর সমস্যার হলো বহুলাংশে সমাধান। জম্মু-কাশ্মীর হারাল তার বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা। সংবিধান থেকে অবলুপ্ত হলো বিতর্কিত ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা। ৫ ও ৬ আগস্ট যথাক্রমে রাজ্যসভা ও লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর আনা 'জম্মু-কাশ্মীর পুনর্গঠন বিলটি বিপুল সংখ্যাধিক্যে পাশ হয়ে গেল। বিরোধীদের অনেকেই দিয়েছেন বিলের পক্ষে ভোট। এমনকী, কংগ্রেসের কয়েকজন করেছেন বিলটিকে সমর্থন। আর মহাজোটের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের দু' একজন সাংসদের মুখে শোনা গেছে অন্য সুর। ফলে কংগ্রেসের মুখ তো পুড়েছেই, তৃণমূল নেত্রীর সাদা শাড়িতেও পড়েছে কালির ছিঁটে। এ এক অবিশ্বাস্য ও অভাবনীয় ঘটনা যেখানে রাজ্যসভায় এনডিএ সংখ্যালঘু। আর এ ঘটনা এটাই প্রমাণ করে, বিরোধীদের অনেককেই দেখতেন জম্মু-কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির স্বপ্ন এবং তাঁদের অন্তরে ছিল বিতর্কিত ধারাগুলির অবলুপ্তির বাসনা। তবে কংগ্রেসের বিরোধিতা স্রেফ বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা। কারণ ৭ দশকের কাশ্মীর সমস্যার স্রষ্টা তো কংগ্রেসই— নেহরু-গান্ধী পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম রাহুলগান্ধীর পূর্বসূরি পণ্ডিত নেহরু। কাশ্মীরের ভারতভুক্তির অন্তরায়ের জন্য মূলত তিনিই দায়ী। কারণ, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সশস্ত্র পাক হানাদারবাহিনী রাতের অন্ধকারে কাশ্মীর আক্রমণ করে শ্রীনগর থেকে মাত্র ৫০-৬০ কিলোমিটার দূরে পৌঁছে গেলে নেহরুর ঘুম ভাঙে। প্রশাসন ও বিরোধীদের চাপে হানাদার বিতাড়নের নির্দেশ দিলে ভারতীয় সেনারা বীরবিক্রমে হানাদারদের তাড়িয়ে পাক-সীমান্তের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। কাশ্মীর হানাদারমুক্ত হতে যখন আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি তখন নেহরু হঠাৎই করেন একতরফা ভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা এবং কাশ্মীর সমস্যাকে নিয়ে যান রাষ্ট্রসঙ্ঘে। তাছাড়া 'গণভোট'-এরও দাবি জানান। অর্থাৎ ঘরের সমস্যা মেটাতে বাইরের সাহায্য নেন। কিন্তু বিগত ৭২ বছরে কাশ্মীর সমস্যা তো মেটেনিই, বরং সমস্যা হয়েছে জটিলতর। কাশ্মীরের প্রায় অর্ধেকটা (অধিকৃত কাশ্মীর) পাকিস্তানের দখলেই রয়ে গেছে। অবশিষ্ট কাশ্মীর দখলে পাকিস্তান সশস্ত্র জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদী ঢুকিয়ে, বিচ্ছিন্নতাবাদে দীক্ষা ও জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবকদের ভারতবিরোধী করে তুলছে। তার প্রমাণ, কাশ্মীরিরা নিজেদের 'ইন্ডিয়ান' বলে না, বলে 'কাশ্মীরি'। পাকমদত ও অর্থানুকূল্যে তারা কাশ্মীরকে করে রেখেছে অগ্নিগর্ভ। পাকগোলা-বন্দুকের গুলিতে প্রতিদিন হতাহত হচ্ছে কাশ্মীরের মানুষ ও ভারতীয় জওয়ানরা। যেন চলছে এক অঘোষিত যুদ্ধ। আর চীন-রাশিয়ার দালাল এদেশের কমিউনিস্টরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদেরও দালাল। কারণ জার্মানি দ্বারা রাশিয়া আক্রান্ত হলে তাঁদের 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ' অতঃপর পাল্টে হয় 'জনযুদ্ধ'। রাতারাতি তাঁরা হয়ে যান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকও, স্বাধীনতা আন্দোলন বিরোধী। ফলশ্রুতিতে কমিউনিস্টরা লাভ করেন ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া প্রভূত সুবিধা এবং প্রতিদানে করেন স্বাধীনতা সংগ্রাম বিরোধী প্রচার। ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন বিপ্লবীদের। তাঁরা নেতাজীকে বলতেন 'কুইস্‌লিং', 'তেজোর কুকুর', 'বিশ্বাসঘাতক', 'আক্রমণকারী' ইত্যাদি। পার্টি মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'তে ছাপা হতো তাঁকে নিয়ে নানা কুৎসিত ব্যঙ্গচিত্র। গান্ধীজীকে বলা হতো 'ভণ্ড', 'ফ্যাসিস্টদের দালাল' ইত্যাদি। আবার মুসলিম লিগের দেশভাগও পাকিস্তান দাবির সমর্থনে তাঁদের বক্তব্য ছিল— 'পাকিস্তান দিতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে', 'পাকিস্তান দাবি ন্যায্য দাবি' ইত্যাদি। তাঁরা ছিলেন কাশ্মীরের পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে। তাঁরা ছিলেন বঙ্গ বিভাগেরও বিরুদ্ধে। তাঁদের ইচ্ছে ছিল, পুরো বাঙ্গলাও থাক পাকিস্তানে। কিন্তু ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাগ করায় এবং কাশ্মীরের ভারতভুক্তির দাবি জানানোয় তিনি ছিলেন তাঁদের দৃষ্টিতে 'সাম্প্রদায়িক'। তাঁদের বক্তব্য, ৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করেনি, ভারতই আক্রমণ করেছে চীনকে। কাজেই, বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী কমিউনিস্ট ও তাঁদের সাগরেদরা যে বিতর্কিত ৩৭০ ধারা বিলোপের প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। অতঃপর কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের বিচার করবে জনগণই।

১৯৫৩-র ১১ মে শ্যামাপ্রসাদ 'এক নিশান, এক বিধান ও এক প্রধান'-এর দাবিতে করেন কাশ্মীরে প্রবেশ। তিনি হন গ্রেপ্তার। কিন্তু বন্দিদশায় ২৩ জুন তাঁর মৃত্যু হয়। অবশ্য তাঁর এই মৃত্যু বিতর্কিত। কারণ অনেকের বিশ্বাস, তাঁকে ষড়যন্ত্র করে হত্যা করা হয়েছে। তাদের আঙুল পণ্ডিত নেহরু ও তাঁর জিগ্‌রিদোস্ত শে আবদুল্লার দিকে। তবে শ্যামাপ্রসাদের যোগ্য উত্তরসূরি নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকার এতদিন পরে ৩৭০ ও ৩৫এ ধারার অবলুপ্তি ঘটিয়ে এক অসাধ্য সাধন করলেন। এবং গুরুস্বপ্ন সফল করে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দিল। অতঃপর পর কাশ্মীরে লাগু হবে ভারতীয় আইন। পৃথক নিশানের বদলে উড়বে তিরঙ্গা। তাই একে 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' বললে হয় না অত্যুক্তি। আবার এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হলো। মোদীর পরবর্তী পদক্ষেপ হোক অধিকৃত কাশ্মীরের ভারতভুক্তি।

—ধীরেন দেবনাথ,
কল্যাণী, নদীয়া।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

শিউলির গন্ধ বলে দেয় মা আসছেন

সুতপা বসাক ভড়

মা যে আসছেন সেকথা কাউকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। গ্রামে-শহরে সব জায়গাতে বৃষ্টির বারিধারায় পৃথিবীকে সিক্ত করে, গাছ-পালা, লতা-পাতাকে স্নান করিয়ে, নদ-নদী ভর-ভরন্ত করে আগমনবার্তার ঘোষণা মা নিজেই করে থাকেন। শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়ানো, হাওয়ায় শিউলি ফুলের এক ঝলক গন্ধ ভেসে আসা—সব মিলিয়ে আমরা অনায়াসেই বুঝে যাই যে মা'র আসার সময় হয়েছে—এবার আমাদেরও মাকে স্বাগত জানাবার জন্য তৈরি হবার পালা। ঘর-দোর পরিস্কার করা, সাজানো-গোছানো, পূজাতে মা এবং বাকি সবার জন্য নতুন জামা-কাপড় কেনার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়।

বাজার ভরা রকমারি জিনিস—জামা-কাপড়, জুতো, গয়না, প্রসাধনী, টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল থেকে শুরু করে কী নেই? দোকানিরা আশা করে আছে বিক্রির জন্য। ক্রেতারা উদগ্রীব কেনার জন্য। আজকাল পূজাতে অনেকেই শুধুমাত্র জামাকাপড় ও জুতোতেই সন্তুষ্ট নন। তাদের চাই দামি ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী। চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। নতুন কাপড় পরে মাকে অঞ্জলি দেবার থেকে তারা ওইসব যন্ত্রপাতিতেই আনন্দ খুঁজে নিতে চান। পান কিনা তা অবশ্য জানা নেই। নতুন প্রজন্মের অনেককেই ঠিক বুঝে উঠতে পারি না—এসব প্রাণহীন জিনিস থেকে কোন প্রাণের আনন্দ তারা খুঁজে পায় জানি না। ভেবে কষ্ট হয় যে তারা বছরের এই একবারের আনন্দকে বুক ভরে নিতে পারে না। মনটা তখন হতাশায় ভরে যায়—ভাবি, মা'র আসা আগামীদিনে কি কেবলমাত্র পঞ্জিকার পৃষ্ঠাতেই থাকবে? আশার কথা, এখন নতুন প্রজন্মকেও দেখেছি যারা গাছে শিউলিফুল ফোটা দেখে নিজের মাকে প্রশ্ন করে, "মা, দুর্গাপূজা কি এসে গেছে?" রেললাইনের ধারে কাশফুল দেখে বলে, "দুর্গাপূজার ফুল ফুটেছে।" ছোটবেলা থেকে ওরা জানে যে প্রকৃতি

এইভাবেই জানিয়ে দেয় মা'র আগমন-বার্তা। এইরকম নতুন প্রজন্মকে দেখে আবার বুক বাঁধি---মা আসবেন আমাদের মাঝে প্রতিবছর---কেউ তাঁকে উপলক্ষ্য করে বিলাস-ব্যসনে গা ভাসাবেন, আবার কেউ বা সাগ্রহে মা'র জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন—ভোরবেলা সিডি-তে চণ্ডীপাঠ শুনে তৈরি হবেন মাকে স্বাগত জানাবার জন্য। তারপর যখন মা আসেন তখন এইসব 'পিছিয়ে পড়া' নতুন প্রজন্ম নতুন গাড়ি, ধুতি-পাজামা-পাঞ্জাবি পরে অঞ্জলি দেয় মাকে। ধুনুচি নাচের সময় ঢাকের তালে খালি পায়ে ধুনচি নিয়ে আরতি করে মাকে প্রণাম জানায় তারা। শাঁখ বাজানোর প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় নতুন প্রজন্মেরই কিছু মেয়ে। সুতরাং, আমাদের হতাশ হবার কোনো কারণ নেই—মা'র আসা, মা'র পূজা এসবই মা'র ইচ্ছা; মা নিজেই তাঁর কাজ করেন ও করিয়ে নেন।

এখন এক প্রহসন চলে দুর্গাপূজার উদ্বোধন নিয়ে—মা'র পূজার উদ্বোধন করেন নামি-দামি ব্যক্তিত্বরা। এঁদের নিয়েও পাড়ায় পাড়ায় রেষারেষি। সার্বজনীন পূজার খরচের বেশ খানিকটা এই পর্বেই হয়ে যায়। আচ্ছা, তাঁরা উদ্বোধন না করলে কি মা আসবেন না? এ কীরকম আদিখ্যেতা? আমরা তো মহালয়া, কলাবউ স্নানের মধ্যেই বুঝে যাই যে মা এলেন বলে—এবার অপেক্ষার পালা শেষ। এইসব তথাকথিত বড় বড় লোকের পেছনে অর্থব্যয় না করে সেই অর্থে কিছু গরিবের কষ্ট লাঘব কি করা যেত না? মা তো সবার। সবাই মিলে আনন্দ করলে তো আনন্দও কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

এরপর ষষ্ঠীর দিন মণ্ডপে যখন মা'কে দেখতে যাই, তখন আরেক বিষম ধাক্কা অপেক্ষা করে থাকে। কে ইনি? ব্যয়বহুল মণ্ডপে, ব্যয়বহুল আলোকসজ্জায় সজ্জিতা, স্বল্প বস্ত্রে, অদ্ভুত ভঙ্গিমায় এ কেমন মা? এই মাকে তো দেখতে আসিনি। আশেপাশের শিল্পরসিক দর্শকেরা 'আর্টের ঠাকুরের' প্রশংসার পঞ্চমুখ। শিল্পে তাদের মতো শরিক সমগ্র বিশ্বে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তারা মাকে খুঁজতে আসেননি তারা তো শিল্পীর পারদর্শিতার প্রশংসক। শ্রীরমেশ পাল, শ্রী পরেশ পাল, শ্রী গৌরাঙ্গ পালেদের তৈরি প্রতিমা দেখতে অভ্যস্ত চোখ মেনে নিতে পারে না 'পোল-ডান্সার' রূপিনী শিল্পকীর্তিকে। মন ভরে না, খুঁজে বেড়ায়। সন্ধ্যারতির সময় আবার গুটিগুটি পায়ে হাজির ছোট্ট একটি পূজামণ্ডপে---একচালার ঠাকুর—কলাবউ, গণেশ, লক্ষ্মী, মাদুর্গা স্বয়ং মহিষাসুরমর্দিনীরূপে, তারপর সরস্বতী, কার্তিক। মা'র পেছনে ঠিক ওপরে শিব ঠাকুরের একটি ছবি। মার গলায় লম্বা ফুলের মালা, ধূপ-ধুনো জ্বলছে, ঠাকুরমশাই নিষ্ঠাভরে পূজা করছেন, পাড়ার পুরুষ-মহিলারা করজোড়ে দাঁড়িয়ে, ঢাকের বাদ্যি, কাঁসর ঘণ্টা, মার আরতি চোখ ফেরানো যায় না। এই তো মা—ইনি তো মৃন্ময়ী নন—এখনও ইনি চিন্ময়ী। এই মাকে বুকে নিয়েই তো আবার এক বছরের জন্য বুক বাঁধি—এইভাবেই যেন মা আমাদের প্রতিবছর দর্শন দিয়ে ধন্য করেন।

পরিশেষে নিবেদন জানাই আমাদের সমাজের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, শিল্পপ্রেমিকদের কাছে—আপনারা শিক্ষিত, শিল্পমনস্ক। আমাদের শিক্ষা, শিল্পকীর্তি দেখানোর বা উপভোগ করানোর জন্য অনেক ক্ষেত্র আছে—বুদ্ধিমান আপনারা, বুদ্ধি করে বছরের একটি বারের দুর্গাপূজাকে নাইবা মাটি করলেন। যে মা দুর্গার অপেক্ষায় আমরা সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি, সেখানে আমাদের কুশিক্ষার দম্ভ আর বিকৃত শিল্পনীতির নিদর্শন নাই বা রাখলেন। ভুলে যাবেন না আমরা মা দুর্গতিনাশিনীর সন্তান।■

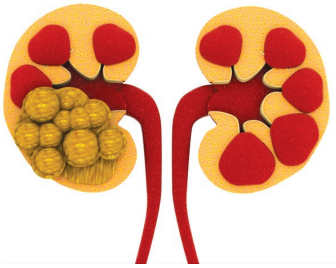

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কিডনি স্টোন থেকে মুক্তি

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মূত্রগ্রন্থি বা কিডনিতে পাথর হওয়ার কথা বর্তমানে শুনলে আঁতকে ওঠার কিছু নেই বা নতুন কিছু নেই বা নতুন কিছু মনে করারও নয়। কিডনির মধ্যে শক্তদানা কঠিন পদার্থ বা স্টোনের মতো জমা হলে তাকে রেনাল স্টোন বা কিডনির পাথর বলে। এই পাথর কখনো মূত্রগ্রন্থি বা কিডনি, মূত্রনালী, আবার কখনো মূত্রথলিতে এসে জমা হয়। এর ফলে বিভিন্ন সমস্যা সহ প্রস্রাব অবরোধ হতে পারে।

কেন হয় কিডনিতে পাথর?

কিডনির কাজ শরীরের রক্ত থেকে ময়লা আবর্জনা ও জল শোধন করে প্রস্রাব আকারে বের করে দেওয়া। দুটি ইউরেটোরের মাধ্যমে প্রস্রাব মূত্রথলিতে এসে জমা হয়। তারপর প্রয়োজন মতো বেরিয়ে আসে। আমরা সারাদিনে যা পানাহার করি তা থেকে শরীরের দরকারি অংশ কোষ নিজে রাখে। বাকি অংশ বর্জ্য পদার্থ রক্তের সঙ্গে মিশে কিডনি এই বর্জ্য রক্ত থেকে বের করে নিয়ে প্রস্রাব আকারে নিঃসরণ করে। তাছাড়া আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিডনি।

কীভাবে বুঝবেন কিডনিতে পাথর আছে?

যে কোনো বয়সে নারী পুরুষ, সবারই কিডনিতে পাথর জমতে পারে। বারবার প্রস্রাবের বেগ, কিডনি বরাবর হয়ে নিম্ন কুচকির দিকে ব্যথা, বুকে প্রসারিত হতে পারে। কুচকি, অণ্ডকোষ প্রভৃতি স্থানে মারাত্মক যন্ত্রণা হতে পারে। যে কোনও ভারী জিনিস তুলতে গেলে বা রাতে ঘুমের ঘোরে হঠাৎ ব্যথার উদ্রেক হতে পারে। অণ্ডকোষ ওপর দিকে টেনে ধরার মতো অনুভব হতে পারে। ব্যথা ও যন্ত্রণা কখনো কখনো বা সব সময় থাকতে পারে। বমি বমি ভাব হতে পারে। হিক্কা, কপালে ঘাম, মূর্চ্ছা যেতে পারে। নাড়ি দ্রুত ক্ষীণ হতে পারে। দেহের তাপ মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ১০৩ ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়। সর্বদাই প্রস্রাব করার ইচ্ছা থাকে কিন্তু প্রস্রাব হয় না। প্রস্রাব ফোঁটা ফোঁটা বের হয়। তলপেটে ব্যথা হয়। প্রস্রাবে পুঁজ ও রক্ত মিশ্রিত থাকতে পারে। কোনো কোনো অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রোগী বোধ করে পাথর যেন নড়াচড়া করে। ছোটো শিশুরা প্রস্রাব করতে গিয়ে কান্না করতে থাকে।

এ বিষয়ে একটি কথা উল্লেখ করছি, দেখা গেল যে চার বছরের একটা শিশু এসেছিল। তার কিডনিতে বেশ কয়েকটি স্টোন হয়েছিল। সে আমাকে জানালো শেষ দিন আমার অনেক কষ্ট হয়েছে, অনেকক্ষণ কেঁদেছি, সহ্য করতে না পেরে একটা কাঠি দিয়ে খুটে ও টিপে বের করেছি। পরে অনেকক্ষণ রক্ত আসছে। তাই বলি এখন ছোটোদের দেখা যায়।

আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা :

প্রথমত হিস্ট্রি নিয়ে বোঝা যায় এক্স-রে করে, আল্ট্রাসোনোগ্রাফ করে, আইভিও করে প্রস্রাব পরীক্ষা করে জানতে পারে কিডনির স্টোনের অবস্থা।

রোগ মারাত্মকের কারণে প্রয়োজন চিকিৎসা :

এর জটিলতা স্বরূপ সংক্রমণ, শরীর হাত পা ফুলে যেতে পারে, কক্সিমিয়া, মূত্র অবরোধ হয়ে যন্ত্রণায় অস্থির ও অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

চিকিৎসা :

হোমিওপ্যাথিতে কিডনির স্টোনের জন্য অনেক ওষুধ আছে। তবে এই ওষুধগুলো অ্যালেপ্যাথির মতো ধারাবাহিক ভাবে প্রয়োগ করা চলে না। প্রতিটি ওষুধই আলাদা লক্ষণ সদৃশে ব্যবহার করে থাকে। যেমন, লাইকোপোডিয়াম, লিথিয়াম কার্ব, সার্সাপেরিলা, থ্যালপসি-বার্সা, বারবারিস, ক্যান্থারিস ও ক্যালকেরিয়া প্রভৃতি যা একজন আদর্শ চিকিৎসকের পক্ষে সঠিক মাত্রা শক্তি নির্বাচন সম্ভব।

পাথর যদি বেশি বড়ো হয়ে যায় বা দীর্ঘদিনের হয় তখন তা অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারে না। অর্থাৎ ৫ মিলিমিটারে ছোটো হলে সহজে বেরিয়ে আসে। আমার এক রোগীর কয়েকটি পাথর এসে আর আসছিল না। কিন্তু তার ব্যথা-বেদনা এমনকী যন্ত্রণার লাঘব হচ্ছিল না। তারপর আমি তাকে নিয়মিত ওষুধ সেবনে পরামর্শ দেই। সে তাই করে এবং সাতটি পাথর খণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। তারপরও তাকে বলি এক বছর চিকিৎসা দিতে। সে ৬ মাস চিকিৎসা নেয়। এখনো দেখা করতে আসে, ৫ বছর হলো ভালো আছে। তাই আমি বলি যাদের একবার কোথাও পাথর হয় তা অপসারিত হলে বারবার হতে পারে। এজন্য মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করতে হবে। ওষুধ খেতে হবে।

যা করতে হবে আপনাকে : বেশি জল পানের অভ্যাস রাখতে হবে। বেশি ঠাণ্ডা না লাগানোই ভালো, বেদনা উপশমের জন্য হলকা গরম সেক দেওয়া যেতে পারে। দুধ সাগু, বার্লি দধি সুপথ্য ফলমূল, লেবুর শরবত বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ বায়ু।

কিডনি রোগে সতর্কতা :

রোগ নিয়ে অবহেলা, চুন-সুপারি খাবেন না, অম্ল বর্জনকর দ্রব্য, মদ্যমান, ধূমপান, মাংস, গুরুপাক খাদ্য নেবেন না। পেইনকিলার দীর্ঘদিন নেবেন না।

ফোন : ৯৮৩০০২৩৪৮৭/
৯৮৩০৫০২৫৪৩

মুসলমানের মানবাধিকার আছে, হিন্দুর নেই

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

কাশ্মীর অনেক দুঃখ সয়েছে বহুবার। কাশ্মীরের ভূমিপুত্র-কন্যারা বিতাড়িত হয়েছে ভিটেমাটি ফেলে রেখে। পাকিস্তানপন্থীরা কাশ্মীরের মঙ্গল চায় না, কোনও দিন চায়নি। কাশ্মীরে বসে ভারতের কাছ থেকে সবরকম সুযোগ সুবিধা নিচ্ছে, অথচ আনুগত্য পাকিস্তানের প্রতি। কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করার পরিকল্পনা তাদের বহুদিনের। অবশেষে ১৯৮৯-৯০ সালে তারা ওই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে। লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত, যারা প্রাণটা বাঁচাতে পেরেছিলেন কোনও রকমে, সব ফেলে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাঁচ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত আজও ঘরছাড়া, নিজের দেশেই বাস্তুহারা হয়ে রয়েছেন।

বুরহান ওয়ানিকে এরা, অর্থাৎ কাশ্মীরের পাকিস্তানপ্রেমীরা 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দেয়। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ কারা করেছিল? নেহরু, জিন্না— এরা। এরা আবার নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবি করে! ভারতের নবনিযুক্ত গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ কাশ্মীরের ব্যাপারে খুব কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চলেছেন। রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ তিনি কোনও মতেই সহ্য করবেন না। ওয়াসিম ওয়াকার প্রাক্তন সেনাকর্মী গৌরব আর্যর সম্বন্ধে বলেছে যে তার বিরুদ্ধে নাকি শৃঙ্খলাভঙ্গের চার্জ আনা হয়েছিল। তাকে এই মিথ্যাকথনের জন্য ক্ষমা চাইতে বললে তিনি কিছুতেই ক্ষমা চাননি। অমিত শাহ বলেছেন যে, কাশ্মীরিদের কল্যাণ সাধন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব। এই কথাটা পাকিস্তানপ্রেমী সাম্প্রদায়িক কাশ্মীরিদের বুঝতে হবে। গৌরব আর্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অসংখ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন মিলিটারি অফিসার হিসাবে, পরবর্তীকালে শারীরিক কারণে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু আজও তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মিলিটারি ঘাঁটিগুলিতে ঘুরে ঘুরে সেনাদের, প্যারাট্রুপারদের সাক্ষাৎকার নিতে।

অমিত শাহ কাশ্মীরের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছেন বলে জানিয়েছেন। সংসদে তিনি রোডম্যাপ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন দেশভাগের জন্য নেহরু দায়ী। জম্মু ও কাশ্মীর দেশের অভিন্ন অঙ্গ।

এদিকে উত্তরপ্রদেশের মীরাটে বহু মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাচ্ছেন। প্রহ্লাদনগর এরিয়া থেকে দলে দলে হিন্দু পরিবার অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। মূল কারণ, সমাজ- বিরোধীদের দৌরাত্ম্য। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলরের ভাষ্য অনুযায়ী, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের যুবকরা ছুটন্ত বাইকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, জোরে হর্ন বাজাচ্ছে, তাদের প্রধান টার্গেট এলাকার হিন্দু মেয়েরা, যারা দিনে রাতে কোনও সময়ই ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না।

১৫০টি পরিবার ইতিমধ্যে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। তাদের দরজায় তালা ঝুলছে। রাস্তা জনশূন্য। ঘরবাড়ি অনেকে জলের দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বিষয়টির উপর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

হিন্দু সম্প্রদায় ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। ঘটনাটা নতুন নয়, বছর তিনেক আগে থেকেই এই ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। এখন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এই সময় নাসিরুদ্দিন শাহদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না কেন? তাঁরা মৌনীবাবা হয়ে যান কেন? পুরস্কার ফেরত দেওয়া লবিই বা চুপ কেন? তাঁদের প্রতিক্রিয়া এত সিলেক্টিভ কেন?

নিজের দেশ ভারতেই যদি এদের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়, তাহলে এই নিরীহ মানুষগুলি যাবে কোথায়?

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের যখন কাশ্মীর থেকে উৎখাত করা হয়, তখনও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা টুঁ শব্দ করেনি, মিডিয়াও সাড়াশব্দ করেনি, সিউডো-সেকুলার লবি ওই ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি, সম্ভবত মিরাটের উচ্ছেদ হওয়া মানুষগুলির জন্যও এরা চুপ করেই থাকবে। মানবাধিকার সংগঠনগুলিও কোনও আওয়াজ তুলবে না, কারণ এক্ষেত্রে নির্যাতিত মানুষগুলি ধর্মে হিন্দু, কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের এসবে কিছু যায় আসে না। ■

প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে গড়ে উঠবে ‘নতুন কাশ্মীর’

সুজিত রায়

জম্মু-কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা বাতিল হওয়া এবং লাদাখকে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিছিন্ন করে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর থেকে দেশের কোণে কোণে একটা প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে— এর পর কী? কাশ্মীর কী সত্যসত্যই ভারতীয় জনজীবনের মূল স্রোতে মিশে যাবে নাকি আরও বৃহৎ পর্যায়ে কাশ্মীরের মাটিতে জন্ম নেবে ভারত-বিরোধী আন্দোলনের? এই প্রশ্নের ভিত্তিতেই আমরা দেখে নেব— কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ঠিক কোন কোন খাতে বইতে পারে।

সম্ভাবনা : ১

গত ৭২ বছর ধরে চলে আসা সাংবিধানিক স্বীকৃতি তুলে নেওয়ার পরে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-সহ ভারতের চরমতম শত্রুপক্ষ পাকিস্তানকে উস্কানি দিতে শুরু করেছেন মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং ভারতের কিছু হিন্দু অতি-বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মানুষও। যেমন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন— ‘কাশ্মীর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে একজন ভারতীয় হিসেবে আমি গর্বিত নই। কারণ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও সংখ্যাগরিষ্ঠরা সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করে যাচ্ছে। এই যে বিপুল জনসমর্থন, তা আসলে কী আমাদের ভাবতে হবে। এই জনসমর্থন এবং মানুষের অধিকারের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে। ৩৭০ ধারা বাতিল করা শুধুমাত্র সব মানুষের অধিকার বজায় রাখার বিরোধিতা করছে তা নয়, এই পদক্ষেপে সংখ্যাগরিষ্ঠের কথাও ভাবা হয়নি।”

আইনজীবী এ জি নুরানি ভারতীয়ত্বের সংজ্ঞায় কাশ্মীরি জনতার স্বাভাবিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াও আঘাতপ্রাপ্ত হবে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্পষ্টতই মেহবুবা মুফতি, শাহ ফয়সল এবং ওমর আবদুল্লাহর মতো কেন্দ্র বিরোধী কাশ্মীরি নেতৃত্বকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ‘যৌথ কাশ্মীর’ আন্দোলন গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন যাতে করে মর্যাদা কমানো সত্ত্বেও কাশ্মীরের স্থানীয় মতামত জাতীয় মঞ্চে পৌঁছে দেওয়া যায়। খুব স্বাভাবিকভাবে এই মতামত যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অনুকূল হবে না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সমাজবিজ্ঞানী নীতীন পাই মনে করছেন, জনমতকে অগ্রাহ্য করে কাশ্মীরের মর্যাদা বদলের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ জনতার ওপর। যার ফলে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাড়তে পারে ভারত-বিরোধী মনোভাব। তাঁর বক্তব্য, মর্যাদা বদলের সুফল নিয়েই আলোচনা হচ্ছে বেশি, কুফল নিয়ে নয়।

ইতিমধ্যেই এই সব মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে একাধিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। বোড়োল্যান্ড, গোর্খাল্যান্ড, নাগাল্যান্ড-সহ আরও কিছু আন্দোলনের নেতৃত্ব কাশ্মীর বিষয়ক পদক্ষেপের প্রকাশ্য বিরোধিতায় নেমেছেন। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে নাগাল্যান্ডে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার বদলে উঠেছে স্বাধীন নাগাল্যান্ডের পতাকা।

এই সমস্ত ঘটনাবলী যে ভবিষ্যতের পক্ষে শুভদায়ক হবে এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই। বিশেষ করে কাশ্মীর ইস্যুতে যেখানে মুসলমান দেশ পাকিস্তান অনবরত হুমকি দিয়ে চলেছে ভারতবর্ষকে। এখনও কাশ্মীরে জনজীবন পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। বিশাল সংখ্যক সেনা ও আধা সেনার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন কাশ্মীরবাসী। কাশ্মীরে বসবাসকারী জঙ্গিবাহিনী এখন গর্তে লুকিয়ে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ হয় জেলবন্দি অথবা গৃহবন্দি। এঁরা কেউই যে এত সহজে দীর্ঘ ৭২ বছর ধরে লালন করে আসা মৌরসিপাট্টাকে হাতছাড়া করতে চাইবেন না তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে কাশ্মীরে

যে পুনরায় অশান্তির অগ্নিগোলক জেগে উঠবে না, তা জোর করে বলা যাচ্ছে না।

সম্ভাবনা : ২

মোগল বাদশা জাহাঙ্গির প্রথমবার কাশ্মীর ভ্রমণের পর লিখেছিলেন— 'অগর ফিরদস বা রয়-ই-জমিন অস্ত্, হামিন অস্ত্-উ-হামিন অস্ত্-উ-হামিন-অস্ত্। অর্থাৎ স্বর্গ যদি কোথাও থেকে থাকে, এইখানে তা, এইখানেই তা আছে। প্রাচীনকালে পুণ্যভূমি 'কাশ্যপমর' যার নামকরণ হয়েছিল প্রাচীন ভারতীয় ঋষি কশ্যপ মুনির নামে। গ্রিকরা বলত কশিপোরিয়া। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ কাশ্মীরকে বর্ণনা করেছেন কাশীমিলো বলে। এখানে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন সম্রাট অশোক। পরবর্তীকালে শৈবধর্ম প্রসার লাভ করে। কাশ্মীরি পণ্ডিত, যারা এখানকার ভূমিপুত্র, তারা হলেন কশ্যপ মুনির বংশধর। ১৩৪৬ সাল পর্যন্ত এখানে হিন্দু রাজাই রাজত্ব করেছেন। তারপরেই শুরু হয় মুসলমান আগ্রাসন। স্বাধীনতার সময় পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের চেহারা বদলে যায়। হিন্দুদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। ধর্মান্তরিত হতে হয়। অশিক্ষিত বাহুবলী মুসলমান জঙ্গিরা ধীরে ধীরে পাকিস্তান সীমান্ত পার হয়ে আস্তানা গাড়ে কাশ্মীরে। আওয়াজ ওঠে স্বাধীন কাশ্মীরের। এই স্বাধীনতার দাবি কিন্তু সাধারণ কাশ্মীরবাসীর নয়। জম্মু ও কাশ্মীরে মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। সব মিলিয়ে মাত্র ১৫ শতাংশ। এই স্বল্পসংখ্যক কাশ্মীরবাসী বিশ্বাস করেন, আগুন নিয়ে খেললে, আগুনে পুড়েই মরতে হয়। সুতরাং তারা চায় শান্তি। কিন্তু পাক-মদতে পাকিস্তান থেকে আই এস আই হাওয়ালা রুটে পাঠায় বিপুল অর্থ। যুবকদের দলে টানে, একঘণ্টা পাথর ছুঁড়লে ৫০০ টাকা। সেনার ওপর গ্রেনেড ছুঁড়লে হাজার টাকা। সেনা তো আর চুপ করে থাকে না। গুলি ছোঁড়ে। মৃত সন্তানের দেহ কোলে নিয়ে চোখের জল ঝরায় মা। এ দৃশ্য আর কতদিন দেখবে কাশ্মীরবাসী?

আজ যখন জম্মু ও কাশ্মীর ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল স্রোতে ফিরে এসেছে, তখন কাশ্মীরবাসী অবশ্যই চাইবে, তাঁদের সন্তান শিক্ষিত হোক। তাদের বেকার যুবক কাজ পাক। ব্যবসাপাতির সুযোগ বাড়ুক। দারিদ্র্য আর লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি ঘটুক সংসারের। মেয়েরাও শিক্ষিত হোক। তাদের ভালো ঘরে শাদি হোক। কাশ্মীরের বরফঢাকা হিমালয়ের প্রান্তভূমি থেকে উঠুক নতুন দিনের সূর্য। কেন্দ্র আশ্বাস দিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

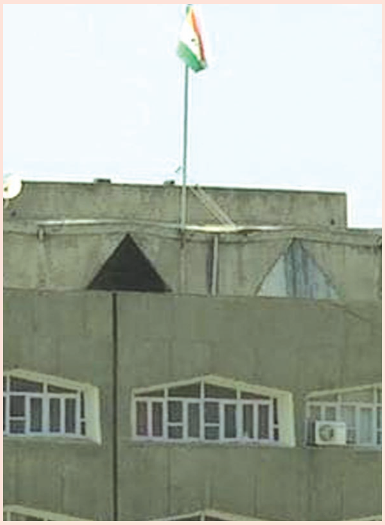

জম্মু-কাশ্মীরের পৃথক পতাকা নামিয়ে ভারতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো শ্রীনগর সিভিল সেক্রেটারিয়েটে।

স্পষ্টতই বলে দিয়েছেন— কাশ্মীরের উন্নতি হবে চোখে পড়ার মতো। গড়ে উঠবে নতুন নতুন হোটেল, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। কাশ্মীরের ভূমিপুত্র পণ্ডিত সমাজ ফের ঘরে ফিরতে পারবে। কাশ্মীরে জনসংখ্যার ভারসাম্য ফিরে আসবে আবার। ফিরবে কাশ্মীরের মূল সংস্কৃতি ও সামাজিক ধারা।

ইতিমধ্যেই রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানি কাশ্মীরে মোটা অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করবেন বলে বিবৃতি দিয়েছেন। বহু জাতীয় ব্যবসায়ী লাইনে দাঁড়িয়েছে কাশ্মীরে জমিজায়গা কিনে ব্যবসা করার জন্য। এগুলো সবই ইতিবাচক ইঙ্গিত। কিন্তু এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের সবচেয়ে বড়ো দায়িত্ব, কাশ্মীরবাসীর মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং ভারতবর্ষের মূল স্রোতে কাশ্মীরবাসীকে যুক্ত করে এই আশ্বাস দেওয়া যে, তাদের মঙ্গলের দায়িত্ব ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণের, পাকিস্তানের নয়। অতীতে ভারতীয় রাজনীতিতে নেহরু-সহ বিভিন্ন রাজনীতিবিদ যে ভুল করে গেছেন তারই প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য সংবিধান সংশোধনের এই মূল দিশা। সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন— কাশ্মীর থেকে জঙ্গি নাশ করায় কেন্দ্র সাফল্য পাবে কতটা? এ ব্যাপারে কেন্দ্রের উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে থাকবে কাশ্মীরবাসী। কিন্তু এটাও ঠিক, তাঁদের সার্বিক সাহায্য ছাড়া সরকার একক প্রচেষ্টায় সাফল্য পেয়ে যাবে--- এমনটা মনে করা অর্থহীন। অর্থাৎ যেটা বলা দরকার— তা হলো কেন্দ্র কাশ্মীর প্রসঙ্গে ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখিয়েছে। এবার কাশ্মীরবাসীকে সেই পদক্ষেপের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে যেতে হবে উন্নয়নের সূচক পূরণের লক্ষ্যে।

সম্ভাবনা : ৩

কাশ্মীরের সাংবিধানিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয় বিষয়। কিন্তু পাকিস্তান মনে করছে— এটা তাদের গালে একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়। নিজেকে বিশ্বের মুসলমান সমাজের ত্রাতা হিসেবে ভেক ধরে তাই পাকিস্তান এখন বিশ্বের দরবারে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছে। অন্যান্য দেশ তো বটেই, যখন মুসলমান প্রধান দেশগুলিও পাকিস্তানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তখন পাকিস্তান যুদ্ধের হুমকি দিতে শুরু করেছে। এমনকী পরমাণু অস্ত্রেরও জুজু দেখাচ্ছে ভারতকে। পরমাণু যুদ্ধের কথা আসেই না, এমনকী খুব শীঘ্র পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করে দেবে— এমন সম্ভাবনা দূর-অস্ত বলেই মনে হচ্ছে। কারণ একের পর এক সার্জিক্যাল স্ট্রাইক এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে পাকিস্তানের মুখে চীন চুন-কালি মাখিয়ে দেবার পর দম ফুরিয়ে গেছে পাকিস্তানের। এখন শুধুই মুখেন মারিতং জগৎ। কিন্তু সবটুকু হালকাভাবে নেওয়ার বিষয় নয়। ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও, চোরাপথে ভারতের অভ্যন্তরে চোরাগোপ্তা আক্রমণ করতে পারে পাকিস্তান। যেমন অতীতে বহুবার হয়েছে। আশা করা যায়, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক। তবে সতর্কতা বেশি দরকার কাশ্মীরের অভ্যন্তরে। কারণ কাশ্মীরের মাটিতেই 'গণহত্যা' ঘটিয়ে পাকিস্তান ভারত সরকারের বিরুদ্ধে 'মুসলমান হত্যা'র দোষারোপ চাপাতে পারে এবং কাশ্মীরের অভ্যন্তরে ভারত-বিরোধী আন্দোলনকে উস্কে দিতে পারে। এমনকী ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বাঁধিয়ে দিতে পারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কিংবা রাসায়নিক বিষ-যুদ্ধ। কেন্দ্রকে তাই কড়া নজর যেমন রাখতে হবে, তেমন ভাবেই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ প্রতিটি ভারতবাসীকেও যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে।

অতীতে মহম্মদ আলি জিন্নার জেদ এবং জওহরলাল নেহরুর তোষমূলক নীতিপুষ্ট ভ্রান্তির জেরে ভারতবর্ষ ৭২ বছর ধরে কাশ্মীর নামক ক্ষতটিকে পুষে এসেছে। এবার সেই ক্ষত থেকে ভারতবর্ষকে স্বস্তি দিতেই সংবিধান সংশোধন। ভারত সরকারের এই প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে গোটা ভারতবর্ষ ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমনকী জম্মু, কাশ্মীর, লাদাখও— এটাই ভবিষ্যতের আশা। অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সমস্ত নেতিবাচক সম্ভাবনাকে দূরে সরিয়ে কাশ্মীরবাসী প্রকৃত অর্থেই এখন ভারতবাসী— এই সত্যকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে নতুন কাশ্মীর গঠনের পথে। ■

৩৭০ ধারা বিলোপের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের বিক্ষোভ।

কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ ও বামপন্থীরা

জিষ্ণু বসু

পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা আজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে বামফ্রন্ট একটি আসনও জিততে পারেনি। আজ সরকারি অফিসে, ভদ্রলোকের বাড়িতে, দোকানে জোর করে পার্টির মুখপত্র দেওয়ার জুলুম আর নেই। পাড়ার মোড়ে বা রেলস্টেশনে যে টিনের বোর্ডে ওই কাগজ লাগানো হতো তা জং পড়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে। ১০টার বদলে এক জায়গায় কাগজ সাঁটা হয়। বিশেষ কেউ পড়েও না। বরুণ সেনগুপ্তের মতো প্রথিতযশা সাংবাদিক ওই মুখপত্রের প্রবন্ধের জবাব লিখে সম্পাদকীয়, উত্তর সম্পাদকীয় প্রকাশ করতেন। আজ সেই রাবণও নেই আর লঙ্কায় লম্ফঝম্ফও নেই। এখন কোনো মূল ধারার কাগজে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির দলীয় মুখপত্র কী লিখছে তা নিয়ে একটি লাইনও ছাপা হয় না।

তাই লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেল এক ভয়ানক প্রয়াস। বিগত ৬ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত এই মুখপত্রের প্রথম পাতায় কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিরোধিতা ছাড়া অন্য কোনো খবর প্রায় ছাপাই হয়নি। সম্পাদকীয় পাতায় গত ১০ দিনের সিংহভাগটাই কাশ্মীর। খবরগুলো প্রকাশের ভঙ্গি খুব মজার। প্রথম তিন চার লাইন কেবল সেদিনের খবর। তারপরের দশ লাইন নরেন্দ্র মোদী সরকারের অসহিষ্ণুতা। শেষের কুড়ি পঁচিশ লাইন সারা পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদের ছাপ ইত্যাদি। কিন্তু প্রথম পাতায় শিরোনামে বড়ো বড়ো করে ছাপা হয়েছে কাশ্মীরের মানুষের কষ্ট, খাবার নেই, ওষুধ নেই, সেনাবাহিনীর অত্যাচার— যার বেশিরভাগটাই কষ্টকল্পিত। কিন্তু লাগাতার ছেপে যেতে হয়েছে এই মুখপত্রে। এর কারণ কী? আজ একবার ফিরে দেখা দরকার।

আসলে কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত বামপন্থীদের বহুদিনের বানানো স্বপ্নের সৌধকে চুরচুর করে দিয়েছে। সেই হতাশার প্রকাশ ঘটেছে সীতারাম ইয়েচুরির শ্রীনগরে দৌড়ে যাওয়া থেকে দলীয় মুখপত্রে লাগাতার বিরোধিতা করার মধ্যে। কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া— পরে এর থেকে তৈরি হওয়া সবকটি ভাগের কোনো নেতাই প্রথমে চায়নি ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড শক্তিশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করুক। তাদের সামনে মডেল ছিল পূর্ব ইউরোপ। গরম সাগরে শীতেও জাহাজ আসতে পারত। তাই এই 'ইস্টার্ন ব্লক' দখল করা রাশিয়ার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই পূর্ব জার্মানি পোল্যান্ড। চেকোশ্লোভাকিয়া। হাঙ্গেরি রোমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মতো ছোটো ছোটো দেশে সোভিয়েত বশংবদ সমাজবাদী সরকার বসাতে থাকে। পোলিশ পিপলস রিপাবলিক স্থাপিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। সেখানে একটিমাত্র দল মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট কমিউনিস্ট, সরকার চালায় ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত। সোভিয়েত মদতে এরা দেশের সব ক্ষমতা হাতে নিয়ে নেয়। প্রতিটি নির্বাচনে রিগিং করে। সোশ্যালিস্ট

কলকাতার কেওড়াতলায় শ্যামাপ্রসাদের শেষকৃত্যে জনসমাগম।

রিপাবলিক অব রোমানিয়াও স্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালে। সেখানেও এক দলীয় কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসে। তারপর সব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বন্ধ করে দেয়। ভারতবর্ষও যদি ছোটো ছোটে টুকরো হয় তবেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বশংবদদের বসাতে পারবে। তাই মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবি কমিউস্টি পার্টি অব ইন্ডিয়া সর্বশক্তি দিয়ে সমর্থন করল। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতার শহিদ মিনারের (অক্টোলনি মনুমন্ট) নীচে মুসলিম লিগের সভা হলো। তাতে আমন্ত্রিত ছিলেন সিপিআই দলের জ্যোতি বসু। সেই সভা থেকেই সোহরাওয়ার্দি হিন্দুদের বিরুদ্ধে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ডাক দিয়েছিলেন। কলকাতা-সহ সমগ্র বঙ্গপ্রদেশে শুরু হয় ভয়াবহ দাঙ্গা।

মজার বিষয় হলো দেশ ভাগের সময় মুসলিম লিগের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতার কোনো ফলই পাকিস্তানে বামপন্থীরা পায়নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই ভূমিসংস্কারের অঙ্গীকার করে। সিপিআই ভূমিসংস্কার আন্দোলন করেই গ্রামে শক্তি বৃদ্ধি করে। পশ্চিমবঙ্গেও 'লাঙ্গল যার জমি তার' স্লোগান জনপ্রিয় হয়। ১৯৪০ সালে ভারতবর্ষে জমিদারি বিলোপ আইন পাশ হলো। কিন্তু মুসলিম লিগ পাকিস্তান তৈরি হওয়ার পরেও ভূমিসংস্কারের কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। করেওনি। ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান তৈরি হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সাজাদি জাহির সম্পাদক হলেন।

কিন্তু পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি কখনোই শিকড় প্রবেশ করাতে পারেনি। আজ তো পাকিস্তানের কোনো শহরে কমিউনিস্ট পার্টির সাইনবোর্ডও নেই। কমিউনিস্ট পার্টির কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ছিলেন ইলা মিত্র। ইলা মিত্রকে রাজশাহি ও নবাবগঞ্জের জেলে যে অত্যাচার করেছিল মুসলিম লিগ সরকার তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। একজন মহিলা রাজনৈতিক বন্দিকে এমন আচরণ করা যায় তা দেখে সারা পৃথিবী শিউরে উঠেছিল। ১৯৫৪ সালে ইলা মিত্রকে পাকিস্তানের ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার কলকাতায় পাঠিয়ে দিল। ইলা মিত্র আর পাকিস্তানে ফেরেননি। ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। এই ছিল পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির ভবিতব্য। তবু স্বাধীনতার পরেও বামপন্থীরা ইসলামি মৌলবাদকে সর্বদা সমর্থন করেছেন।

পূর্ব ইউরোপের টুকরো টুকরো ছোটো দেশের ভাবনা মাথায় নিয়েই কি স্বাধীনতার পরে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন কমিউনিস্ট নেতৃত্ব। সালটা ১৯৫০। ভারত থেকে গিয়েছিলেন বাসবপুন্নাইয়া, এস. এ. ডাঙ্গে, রাজেশ্বর রাও আর অজয় ঘোষ। মাকিনেনি বাসবপুন্নাইয়া পরে সেই বৈঠকের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে সেখানে মিলিত হয়েছিলেন জোসেভ স্ট্যালিন, ভিয়াচেসলভ মিখাইলচ মলোটভ, মিখাইল আন্দ্রেইচ সুসলভ আর জিওরগি ম্যাক্সিমিলিয়ানোইচ মেলেনকোভ। ভারত থেকে যাঁরা গিয়েছিলেন তারা তেলেঙ্গানার আন্দোলনের কথা বুঝিয়েছিলেন। পোল্যান্ডে তো এর থেকেও ছোটোখাটো আন্দোলন হয়েছিল। রাশিয়া তো আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নামে সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভারতে কেন সাহায্য করবে না রাশিয়া?

স্ট্যালিন ইংরেজি বলতে পারতেন। তবে এতসব তাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি। সব শুনে বললেন, ''তোমাদের পার্টির অস্তিত্ব স্বাধীন। আজ আর কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রয়োজন নেই। ওটা শেষ হয়ে গেছে। পৃথিবীর একটি মাত্র জায়গা থেকে আমরা কমিউনিস্ট আন্দোলন চালাতে পারব না। তাই তোমরা তোমাদের পথ নিজেরাই দেখে নাও।''

আজ ভাবতে অবাক লাগে যে ঠিক সেই সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রাশিয়ার কোনো কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনি কেজিবি ভল্টে ছিলেন নাকি ম্যাগনিতোগোরসকের কোনো গ্রামে সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টে পরিষ্কার বক্তব্য যে, নেতাজী সুভাষ হারিয়ে যাওয়ার পরে রাশিয়াতেই ছিলেন। কিন্তু ১৯৪৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যার 'পিপলস ওয়র' প্রথম পাতায় নেতাজী সুভাষের ব্যঙ্গচিত্র করেছিল। তার কিছুদিন আগেই ১৮ জুলাই কমিউনিস্ট মুখপত্র 'পিপলস ওয়র' পত্রিকায় জি. অধিকারী লিখেছিলেন, ''হিটলার বোসকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজোর কাছে পাঠিয়েছেন। ...হিটলার-তেজো- বোসের চক্রান্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমাদের ভ্রাতৃপ্রতীম চীনের স্বার্থে আমরা ওদের থেঁতলে দিতে পারি আর সেটাই করব।'' ১৯৪২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর এস ভি সরদেশাই লিখলেন, ''এই যে আজাদ হিন্দ রেডিও গান্ধীজীর জয়ধ্বনি করছে সেটা বিনা

কলকাতায় ট্রাম পুড়িয়ে বামপন্থীদের প্রতিবাদ।

কারণে নয়। আসলে গান্ধীই সুভাষের মতো ফাঁসুরেকে তৈরি করেছে।" ১৯৪৩ সালে ২৫ জুলাই ওই পত্রিকায় প্রথম পাতায় নেতাজী সুভাষকে তোজোর গাধা হিসাবে একটি ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। ওই পত্রিকায় কখনো বা নেতাজীকে কুকুর হিসেবে কোনো জাপানি জেনারেল ধ্বনিবর্ধকের সামনে ধরে আছে সেরকম ব্যঙ্গচিত্রও দেখানো হয়েছে। নেতাজী সম্পর্কে যে দলের এমন বিরূপ অবস্থন সেই দলের সদস্যরা স্ট্যালিনের সঙ্গে সুভাষের জীবিত ফিরে আসার বিষয়ে কী কথা বলবেন তা সহজেই অনুমেয়।

যাই হোক, স্ট্যালিন ভারতের কমিউনিজমের বিষয়ে হাত ধুয়ে ফেলায় বাসবপুন্নাইয়ারা কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি। রাশিয়া থেকে ফিরে এসে লিখলেন অন্ধ্র থিসিস। মূল ভাবনা বাসবপুন্নাইয়ার কিন্তু রাজেশ্বর রাও, সুন্দরাইয়া, চন্দ্রশেখর রাও, হনুমন্ত রাও সকলেই এর বুদ্ধিদাতা ছিলেন। সকলেই একমত যে ভারতকে টুকরো টুকরো হতেই হবে। প্রদেশে প্রদেশে এলাকা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন চলবে। রাশিয়া যখন মুখ ফিরিয়েছে তখন চীনই ভরসা। তারা যুক্তি দিলেন চীন ভারত দুটোই ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল, কৃষিপ্রধান দেশ আর মানুষজনও একরকম। তাই মাও আর তার থিসিসই কার্যকর হবে। এই বিতর্কের মধ্যেই বহিষ্কৃত হলেন ভালচন্দ্র ত্রিমবক রণদিভে। যিনি ১৯৪৮ সালে কলকাতার দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে রনদিভেকে 'হঠকারী বামপন্থী' দুর্নাম দিয়ে চলে যেতে হলো।

১৯৫০ থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত এই টুকরো টুকরো করার দল একটু থিতিয়ে গিয়েছিল। জওহরলাল নেহরু সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে, সোভিয়েত অর্থনীতিকে ভারতীয় বাজার লোটার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এই কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার দিকে ফিরেও তাকায়নি। তাই যখনই এই কমিউস্টি পার্টি ভারতবর্ষ ভেঙে টুকরো হওয়ার সম্ভাবনা বা ভারতকে একসূত্রে বাঁধার কোনো বিরোধীকে আবিষ্কার করত তাকেই সমর্থন করত। কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লা এমনই এক বিচ্ছিন্নতাবদী নেতা ছিলেন।

১৯৪২ সালেই শ্রীনগরে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার একটি শাখা শুরু হয়। সে বছর সেপ্টেম্বর মাসে লাহোর থেকে আসেন ফজল ইলাহি কুরবান। ফজল সাহেব খুব পরিচিত কমিউনিস্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি একটা বোট হাউসে একটি অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট বৈঠক করেন। তাতে ন্যাশনাল কনফারেন্সের মহম্মদ সাদিক উপস্থিত ছিলেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ছিলেন পিসি জোশী। ১৯৩৫ থেকে ৪৭ সাল পর্যন্ত তিনিই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ১৯৪৬ সালে মওকা বুঝে সিপিআই আজাদ কাশ্মীরকে সমর্থন শুরু করল। ওখানের কনিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা ন্যাশনাল কনফারেন্সে ঢোকা শুরু করল। শেখ আবদুল্লা যখন সরকার বানালেন তখন তাতে একঝাঁক কমিউনিস্ট নেতা মন্ত্রী। শেখ আবদুল্লার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন বিপিএল বেদি। বেদি সুপরিচিত কমিউনিস্ট মুখ ছিলেন, ন্যাশনাল মিলিশিয়ার আয়োজক ছিলেন। আবদুল্লার সঙ্গে সেদিন ছিলেন বিপিএল বেদি, ধন্বন্তরী, রাজবংশ কৃষাণ, সুমিত্রা আর ঊষারা, যারা কেউ কালচারাল ফ্রন্ট, কেউ উইমেন স্কোয়ার্ডের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস। তৈরি হলো কমিউনিস্ট পার্টি অব পাকিস্তান। দায়িত্ব পেলেন সাজ্জাদ জাহির। জাহির গদগদ হয়ে পিসি জোশিকে কাশ্মীরে আসতে বললেন, বললেন দেশটার দখল নিন। তার ভাষায় ছিল তখন 'কোস্ট ওয়াজ ক্লিয়ার।' জোশি অত সাহস দেখাননি উনি সবকটি পথই খোলা রেখেছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সরকারের পাঠানো পাস্তুন বর্বর আক্রমণের জন্য ইংরেজদের দায়ী করে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে বয়ান দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রস্তাবের কথা কংগ্রেসের কৃষ্ণমেননের মতো কয়েকজনকে বলে তাদের উপদেশ চাইলেন, আর কাশ্মীরের মাটিতে বিদ্রোহের আগুনে ঘি ঢাললেন।

এদিকে কাশ্মীরের ভূরাজনৈতিক গুরুত্বের জন্য রাশিয়ার দিক থেকেও চাপ বাড়ছিল। সেই পূর্ব ইউরোপের পদ্ধতিতে কাশ্মীর চাই। ১৯৪৯ সালের ৪ জুন শেখ আবদুল্লাকে লেখা চিঠিতে পণ্ডিত নেহরু বললেন, ''যদিও কাশ্মীরে কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের বিষয়ে আমি বিশেষ চিন্তিত নই তবু খোঁজখবর নেওয়া বন্ধ করা ঠিক হবে না। গত বছর কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া এক অদ্ভুত আচরণ করেছে। এটা কমিউনিজমের পথ নয়।" ওই বছরে পিসি জোশীদের কীর্তিকলাপ নেহরুকে বেশ চাপে রেখেছিল। ১৯৪৯ সালের ৩০ মে আরেকটি চিঠি লেখেন নেহরু। ''বেশ কয়েকটি দূতাবাস কাশ্মীরে কমিউনিস্ট অধিগ্রহণ নিয়ে উদ্বিগ্ন। ...কারণ পরিচিত কমিউনিস্টরা ওখানে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।"

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লিতে এক মার্কিন কূটনীতিক ব্রিটিশ হাইকমিশনের এক আধিকারিককে বলেছিলেন শেখ আবদুল্লা বামপন্থী আর বক্সি গোলম মহম্মদ তো প্রকাশ্যেই কমিউনিজমের কথা বলে। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ হাইকমিশনের এক গোয়েন্দা রিপোর্টে জনানো হলো কাশ্মীরের উপমুখ্যমন্ত্রী, দুজন অন্য মন্ত্রী আর ভারত ও পাকিস্তানের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব কাশ্মীরকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ করতে চাইছে। ১৯৪৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর কাশ্মীরে পণ্ডিত নেহরুকে হেনস্থা হতে হয়। গোয়েন্দা সূত্রে বলা হয় যে এর কারণ কেবল বিদেশিরা নয়, গেলাম মহম্মদ সাদিক, শের জং আর অন্য কমিউনিস্টরা (টি জি সঞ্জীভি পিল্লাই, অধিকর্তা। গোয়েন্দা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া রিপোর্ট)।

১৯৫৩ সালে যখন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আম্বালা বা জলন্ধর পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন এই দাবিতে যে এক দেশে আলাদা সংবিধান, আলাদা উজির-ই-আজম আর আলাদা সুপ্রিম কোর্ট কেন হবে, তখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব শেখ আবদুল্লার উপর থেকে কিছুটা কমেছে। শেখ আবদুল্লা ধীরে ধীরে সরে আসেন, ১৯৪৮ সালে সিপিআই নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকে ১১ মে গ্রেপ্তার হলেন শ্যামাপ্রসাদ, সঙ্গে জনসঙ্ঘের নেতা গুরু দত্ত বৈদ্য, টেকচাঁদ ঠাকুর আর তরুণ সাংবাদিক অটলবিহারী বাজপেয়ী। ১ মাস ১২ দিন দুর্বিষহ অত্যাচার করে শ্যামাপ্রসাদকে প্রকারান্তরে হত্যা করেন শেখ আবদুল্লা। ২৩ জুন মারা গেলেন শ্যামাপ্রসাদ। শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ মাঝরাতে কলকাতা বিমানবন্দরে আনা হলো। সেদিন

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভে সামিল বৃন্দা কারাত।

মাঝরাতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল। শত শত মানুষ সে রাত্রে ট্রাম লাইনে শুয়েছিলেন। তারা পরের দিন কেওড়াতলা মহাশ্মশানে শ্যামাপ্রসাদের শেষকৃত্যে অংশ নিয়েছিলেন। এক যুগ মানে ১২ বছর আগে এই মহাশ্মশানে বিশ্বকবির মরদেহ আনা হয়েছিল। সেদিন যে দীপ্ত মানুষটি হাজার হাজার মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে বাঙ্গলার পরম গৌরবের কবিকে বিদায়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন, সেই শ্যামাপ্রসাদের মরদেহ আজ এসেছে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। এর প্রতিকার চাই। নেহরুজীকে কলকাতা থেকে খবর পাঠানো হলো। পশ্চিমবঙ্গ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ হয়ে আছে।

সেই সময় কলকাতায় ট্রাম চালাতো ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি নামে একটি ইংরেজ কোম্পানি। সেই বেসরকারি সংস্থা ১ পয়সা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি করেছিল। শ্যামাপ্রসাদের যেদিন দাহসংস্কার হলো মানে ২৪ জুন, ১৯৫৩ সেদিন ট্রাম কোম্পানি ভাড়া বৃদ্ধির নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেস সরকারের অনুমতিক্রমে। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসুকে সভাপতি করে তার দুদিন পরে ২৭ জুন বামদলগুলির বৈঠক হলো। বৈঠকে তৈরি হলো একটি প্রতিরোধ কমিটি। সিপিআই দলের জ্যোতি বসু, প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির সুরেশ ব্যানার্জি, এস ইউ সি দলের সুবোধ ব্যানার্জি এবং মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের সত্যপ্রিয় ব্যানার্জিকে নিয়ে গঠিত হলো নির্ণায়ক কমিটি। এই উচ্চশক্তিধর কমিটি ১ পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন (সি টি ডব্লু ইউ) এই আন্দোলনে প্রচ্ছন্ন সমর্থন করল। ২৯ জুন 'প্রতিরোধ কমিটি' যাত্রীদের কাছে আবেদন করল, যেন তারা বর্ধিত ভাড়া না দেয়। তারপর কংগ্রেস আর বামদলগুলি চোরপুলিশ খেলতে থাকল। প্রতিরোধ কমিটি ট্রামের ডিপোতে ডিপোতে পিকেটিং শুরু করল। একদিনে ১৩টি ট্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হলো। সিপিআই দলের জ্যোতি বসু, আর গণেশ ঘোষকে, এস ইউ সি দলের সুবোধ ব্যানার্জিকে সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির জ্যোতিষ জোয়ারদারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল ৩ জুলাই। ৪ জুলাই পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদে কমিটি পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল। অতি নিপুণভাবে রাজ্যের মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হলো কত নিষ্ঠুরভাবে পশ্চিমবঙ্গের এতবড়ো এক মহামানবকে মাত্র ১০ দিন আগে খুন করা হয়েছে।

১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধের পরে এই সুপ্ত বাসনা একেবারে প্রকাশ্যে বের হয়ে এল। বাসবপুন্নাইয়ার থিওরিতে এলাকাভিত্তিক স্বায়ত্ত শাসনের পরে। ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিজমের স্বার্থে সোভিয়েত রাশিয়াকে ভারত দখলের আহ্বান ছিল প্রচ্ছন্ন ভাবে। ১৯৬৪ সালের ১১ এপ্রিল সিপিআই দলের জাতীয় অধিবেশনে ৩২ জন সদস্য প্রতিবাদ করে বের হয়ে গেলেন। তারা সভাপতি ডাঙ্গেকে কমিউনিস্ট বিরোধী আখ্যা দিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলানিতে জুলাই মাসের ৭ থেকে ১১ তারিখ পর্যন্ত অধিবেশন করলেন। সেখনে চীনের চেয়ারম্যান মাও-সে-তুং সাহেবের বড়ো প্রতিকৃতি লাগানো হলো। সেখানেই ঠিক হলো ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর কলকাতার ত্যাগরাজ হলে অধিবেশন হবে। সেখানে বাসবপুন্নাইয়ার দলীয় খসড়ার বদলে উঠে এল পরিমল দাশগুপ্ত আর আজিজুল হকের প্রস্তাব। রাশিয়া নয় চীনই প্রভু, টুকরো টুকরো ভারতের কমিউনিস্টদের দখলে আনতে মাওয়ের চীনই সাহায্য করবে। প্রভুর ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল দল।

নকশালবাড়ি আন্দোলনেও এলকাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছিলেন চারু মজুমদার। ১৯৬৭ সলের ৫ জুলাই চীনের সেন্ট্রাল কমিটি অব কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র পিপলস ডেইলিতে প্রকাশিত হলো— 'স্প্রিং থান্ডার ওভার ইন্ডিয়া' বা 'ভারতে বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ।' এদেশের কমিউনিস্ট নেতাদের সেকি উল্লাস। এতদিন প্রভু ভক্তের নিবেদন গ্রহণ করেছেন। কলকাতা-সহ সর্বত্র তখন

দেওয়ালে দেওয়ালে, 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান।'

এই চীন বা পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্র, জাল টাকা, অত্যাধুনিক যুদ্ধ প্রযুক্তি আনতে তাই সব সময় কাশ্মীরের জঙ্গি জেহাদিরা আর কমিউনিস্ট উগ্রপন্থীরা একসঙ্গে কাজ করেছে। চীনের তৈরি টু-স্টেজ ল্যান্ডমাইন দুই দলই ব্যবহার করে। মাওবাদীরা ল্যান্ডমাইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোনো আন্তর্জাতিক আইন মানে না। কাশ্মীরের মুজাহিদিনরাও ল্যান্ডমাইন ভারতকে বিব্রত করতে ব্যবহার করে বলেই চীন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ল্যান্ডমাইন তৈরি করে। ল্যান্ডমাইন মনিটর নামে এক সংস্থার মতে ২০১০ সালে চীনের কাছে ১১ কোটির বেশি ল্যান্ডমাইন মজুত ছিল, দ্বিতীয় স্থানে রাশিয়া অনেক পিছিয়ে মাত্র ২ কোটি ৪৫ লক্ষ। সেই কারণেই এবছর ৪ জুলাই জেনেভাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনেভা সম্মেলনে 'ক্লাস্টার মিউনিশন ব্যান পলিশি বা ল্যান্ডমাইনের মতো ভয়ানক মানবতা বিরোধী অস্ত্র ব্যবহার বন্ধের চুক্তিতে চীন স্বাক্ষর করেনি।

২০১০ সালে কলকাতার সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির অধিকর্তা এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভয়ানক তথ্য দেন। রেডিও কন্ট্রোল্ড এক্সপ্লোসিভ ব রিমোট কন্ট্রোল্ড এক্সপ্লোসিভের প্রযুক্তি ভারতবর্ষে কাশ্মীরি মুজাহিদিনদের মাধ্যমে এনেছে। এরা আফগানিস্তানের তালিবানদের কাছ থেকে এই ভয়ংকর প্রযুক্তি কাশ্মীরের পথে ভারতে এনেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারতকে টুকরো টুকরো করতে চাওয়া। প্রায় সবকটি শক্তির সঙ্গেই কমিউনিস্টরা ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকারদের সঙ্গে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। বিশেষ করে যারা চীনপন্থী ছিলেন তারা সরাসরি পাকিস্তানের খানসেনাদের সবরকম সহযোগিতা করেছিল। মুক্তি যোদ্ধাদের ধরিয়ে দেওয়া, খানসেনাদের হয়ে ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো চিনিয়ে দিতেন। এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন রশিদ খান মেনন, আর তোহা। ১৯৭১ সালে এই রশিদ খান মেনন কাজি জাফর আহমেদ, নজরুল ইসলাম, নাসিম আলিরাই কলকাতা থেকে 'বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের বিপক্ষে হিন্দু নিগ্রহেও একই ভাবে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল।

১৯৫৭ সালে মস্কোতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে 'কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না' গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেরল রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখলকে সমালোচনা করে। তাদের মতে কমিউনিজমের ব্যাকরণে সংসদীয় গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। আজ সত্যি সত্যিই ভারতের কমিউনিস্টরা সংসদীয় গণতন্ত্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম সংসদে সিপিআই দলের ১৬ জন সাংসদ ছিলেন। ১৯৫৭ সালে তা বেড়ে হলো ২৭ জন, ১৯৬২-তে ২৯, ১৯৬৭ সিপিআই ভেঙে গেল, সেবার সিপিআই ২৩ সিপিআইএম ১৯টি মোট ৪২টি, ১৯৭১ সালে মোট ৪৮টি, ১৯৭৭ সালে ২৯টি, ১৯৮০ সালে ৫৩টি পর্যন্ত পৌঁছেছিল সিপিআই ও সিপিআইএমের সাংসদের সংখ্যা, ১৯৮৪-তে কমে ২৯, ১৯৮৯-তে ৪৮টি, ১৯৯১ সালে ৫০টি ১৯৯৪ সালে পেয়েছিল ৪১টি আসন, ১৯৯৯ সালে ৩৭টি, ২০০৪ সালে ৫৩টি, ২০০৯ সালে ১৯টি তারপর ২০১৪ সালের লোকসভাতে সিপিআইএম ৯টি, সিপিআই ১টি ২০১৯ সালে স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে সর্বকালের সর্বনিম্ন আসন পেয়েছে দুটি কমিউনিস্ট দল। এবার সিপিআইএম ৩টি আর সিপিআই ২টি মোট ৫টি আসন সারা ভারত থেকে পেয়েছে। তাই ভারত যত ঐক্যবদ্ধ হবে, কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদ যত দুর্বল হবে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির থেকে লুপ্ত হবে 'টুকরো টুকরো গ্যাং' ততই কমে যাবে কমিউনিস্টদের জনসমর্থন। কারণ ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ভারত আর ভারতের কমিউনিস্টরা পরস্পরের পরিপন্থী।

কাশ্মীরে যখন সেখানকার ভূমিপুত্র আদি বাসিন্দা হিন্দু পণ্ডিতদের মেরে, কেটে, ধর্ষণ করে তাড়ানো হয়েছিল তখন কলকাতায় কোনো বামপন্থী মিটিং মিছিল হয়নি। কিন্তু ২০১৩ সালে উগ্রপন্থী আফজল গুরুর ফাঁসির প্রতিবাদে কমিউনিস্টরা মিছিল করেছিলেন। ২০০১ সালে সংসদ আক্রমণের মূল কাণ্ডারি ছিল এই কাশ্মীরি জেহাদি জঙ্গি। স্বাধীনতার পরে এত বছরে কত হাজার হিন্দুকে বাংলাদেশে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে, এই সেদিন পর্যন্ত গণধর্ষিত হয়েছেন কত মা বোন। কোনোদিন কোনো কমিউনিস্ট দলকে দেখেছেন তার প্রতিবাদ করতে? কিন্তু ইজরায়েল গাজা ভূখণ্ডে কিছু ঘটলে কলকাতার রাস্তা বন্ধ করে মিছিল করেছেন কমিউনিস্টরা।

এসবের পেছনে কোনো মানবাধিকার, অন্যায়ের প্রতিবাদ ইত্যাদি নেই। আছে একটি মাত্র আশা। 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইন্সাল্লা, ইন্সাল্লা।' এই স্বপ্নে বুঁদ হয়েছিল কমিউনিস্টরা ৩৭০ ধারার ঢাল ব্যবহার করে স্বপ্নের সৌধ বানিয়েছিল কাশ্মীরের জেহাদি জঙ্গিরা।

৩৭০ ধারা বিলোপ এদের সকলের স্বপ্নভঙ্গ করে দিয়েছে। তাই এত অস্থির হয়ে উঠেছেন কমরেডরা! ■

আদর্শ শিক্ষক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

ধীরেন দেবনাথ

'Prince of the Students' বা 'Idol of the Students' ইত্যাদি কথার অর্থ আমাদের জানা। কিন্তু প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এসব সম্মানজনক অভিধায় যিনি অভিহিত তিনি কে? তবে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে যাঁকে উদ্দেশ্য করে এসব কথার অবতারণা, তিনি নিঃসন্দেহে একজন স্বনামধন্য শিক্ষক। কারণ ছাত্রদের কাছেই তাঁদের কোনো প্রিয় শিক্ষক হতে পারেন এমনই সম্মানের পাত্র। ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের এখানেই সার্থকতা। ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের পথ-প্রদর্শকই হচ্ছেন তাঁদের শিক্ষক বা শিক্ষাগুরু। তাছাড়া ছাত্রদের কাছে তাঁদেরই কোনো প্রিয় শিক্ষক যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবেন তাতেও নেই কোনো ব্যত্যয়। আর যাঁর সম্পর্কে এতসব কথার উপস্থাপনা, তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের একজন— ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন।

১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর। তামিলনাড়ুর থিরুথানি গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে এই শুভদিনের এক পুণ্যলগ্নে রাধাকৃষ্ণনের জন্ম। তাঁর পিতাও ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। গ্রাম্য পাঠশালা ও বিদ্যালয়ে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করে ভর্তি হন মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৫ সলে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রে এমএ পাশ করার পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। ১৯০৫ সালেই তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পারিবারিক ভাবে তিনি তামিল সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। তাই সেদিন তাঁর পরিধানে

পরম্পরা

ছিল ধুতি, আজানুলম্বিত গলবন্ধ, সাদা কোট ও মাথায় সাদা পাগড়ি। বয়স মাত্র ২১ বছর। এ এক অভাবনীয় ঘটনা। শ্রেণীকক্ষে তাঁর প্রথম দিনের পাঠদানে প্রকাশ পায় তাঁর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, ভাষা, জ্ঞানের গভীরতা ও গাম্ভীর্য। আর ছাত্ররা লাভ করেন এক অনাবিল সুখানুভূতি, বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের না জানা উত্তর এবং দর্শনশাস্ত্র পাঠের উপযোগিতা। অতীব জটিল বিষয়কে সহজ ও সরলভাবে বোঝানোর ক্ষমতা ছিল তাঁর। পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের মনের কথা তিনি জানতেন। তাই তাঁদের দিকে ছিল তাঁর বিশেষ নজর। যতক্ষণ তাঁরা বুঝতে না পারছেন ততক্ষণ তাঁদের বোঝাতেন। অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে তিনি পাঠদানে মগ্ন থাকতেন। তাঁর ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার কথা কোনো ছাত্র ভাবনাতেও আনতেন না। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর ন্যায় মিশতে পারতেন। আবার শ্রেণীকক্ষে তিনি পালন করতেন এক দায়িত্বশীল শিক্ষকের ভূমিকা। তাঁর পাঠদানকালে শ্রেণীকক্ষে বিরাজ করত এক নৈসর্গিক নীরবতা। ছাত্ররা হতেন আপ্লুত ও ঋদ্ধ। পাঠদান শেষে তাঁর শ্রেণীকক্ষ ত্যাগের পরেও ছাত্ররা থাকতেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে— যেন শেষ হয়েও শেষ হয়নি, এমন অনুভূতি দ্বারা তড়িত হতেন তাঁরা। তাঁর মূল্যবান বক্তব্য তাঁরা শুনতেন অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে এবং তাকে স্থান দিতেন স্মৃতির মণিকোঠায়। আর তাঁদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দিতেন তাঁকে। ছাত্ররা বলতেন, রাধাকৃষ্ণন ও 'ফিলজফি' সমার্থক। এক সত্যিকারের দার্শনিক, যাঁর কাছ থেকে শুধু নেওয়া যায়, দেওয়ার কিছু নেই। তাইতো তাঁর এক প্রিয় ছাত্র বলেছেন, "তিনি যা'ই শেখাতেন, কেউই তাকে আঁকড়ে ধরতে ব্যর্থ হতেন না। তাঁর ছোটো ছোটো বক্তৃতাগুলির প্রভাব ছিল এত বিশাল যে তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলি ছাত্রদের কানে বাজত, এমনকী ৫০ বছর পরেও।" সত্যি বলতে কী, তিনি

নিজেই ছিলেন যেন এক গ্রন্থাগার। আবার একথাও সত্যি যে, ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন ভীষণ বইপোকা। পড়াশুনা ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান, জীবন-সাধনা। বাস্তব জীবনে তিনি একজন খ্যাতনামা শিক্ষক হলেও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন জ্ঞানপিপাসু ছাত্র। তিনি জানতেন, শিক্ষা বা শেখার শেষ নেই। তাই তিনি মনে করতেন, তাঁর শেখা, জানা বা শিক্ষা শেষ হয়নি। তাঁর কাছে শিক্ষা ছিল জীবনব্রত। সারাজীবনের এক মহৎ কর্ম। রাধাকৃষ্ণন নাস্তিক ছিলেন না। ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী। জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব জানার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর প্রবল। তিনি অনুভব করতেন স্রষ্টার অস্তিত্ব। তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা-জগতে তিনি খুঁজে বেড়াতেন পরম সত্য ও সুন্দর তথা স্রষ্টাকে। তিনি মনে করতেন, সৃষ্টি আছে তাই স্রষ্টাও আছে। আর যাঁরা তাঁকে নাস্তিক বলে বেড়ান তাঁরাই নাস্তিক, বিজাতীয় আদর্শ ও মতবাদে দীক্ষিত।

১৯১০ সাল। রাধাকৃষ্ণন ভর্তি হন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে। লেকচারার থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। এখানে ঘটে এক বিরলতম ঘটনা। কলেজের মনোবিজ্ঞান (সাইকোলজি) বিভাগের অধ্যাপক তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তাঁকে পড়াতে জানান অস্বীকৃতি। কারণ ছাত্রটি যে তাঁর থেকেও পণ্ডিত। তিনি তাঁকে বলেন, ‘‘আপনাকে আমার দেওয়ার কিছু নেই।’’ এখানে ঘটে আরও এক বিরল ঘটনা। বিভিন্ন কলেজ থেকে ট্রেনিং নিতে আসা একদল অধ্যাপক মনোবিজ্ঞান বিষয়ে তাঁদের যে ঘাটতি রয়েছে তা ক্লাস নিয়ে পূরণ করে দেওয়র জন্য রাধাকৃষ্ণনকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। অগত্যা রাধাকৃষ্ণন অধ্যাপক-ছাত্রদের সেই অনুরোধ রক্ষার্থে বেশ কয়েকটি ক্লাস নেন। অধ্যাপক-ছাত্ররা ভীষণ উপকৃত ও কৃতার্থ হন। তাঁর পাঠদানের বিষয়সমূহ তথা বক্তৃতামালা সন্নিবিষ্ট করে কলেজ কর্তৃপক্ষ ‘অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস’ থেকে একখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নাম— Essentials of Psychology। এও এক আশ্চর্যজনক ইতিহাস। এ ঘটনা থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে রাধাকৃষ্ণন শুধু দার্শনিক তথা দর্শনশাস্ত্রের একজন সুপণ্ডিতই ছিলেন না, ছিলেন মনোবিজ্ঞানেরও একজন সুপণ্ডিত। কারণ সেই প্রেস শুধু লব্ধ প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতদেরই মূল্যবান লেখা প্রকাশ করে। এছাড়াও তিনি সমাজবিদ্যা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সংস্কৃত, তামিল, ইংরেজি প্রভৃতি বিষয়েও ছিলেন অতিশয় কৃতবিদ্য।

অতঃপর ১৯১৬ সালে রাধাকৃষ্ণন বদলি হয়ে আসেন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজমুন্দ্রী কলেজে। এখানে তিনি পান তাঁর প্রিয় ছাত্রকে--- ঈশ্বর দত্তকে। দু'বছর পরে তিনি দর্শনের অধ্যাপক রূপে আসেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মহারাজা কলেজে। এখানে তিনি ছাত্রদের মাঝে বিলিয়ে দেন তাঁর অধিগত জ্ঞান ও বিদ্যা। ছাত্র সমাগমে পরিপূর্ণ শ্রেণীকক্ষে বিরাজ করত অপূর্ব নীরবতা। ছাত্ররা ছিলেন শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরেও যথারীতি সুশৃঙ্খল ও বন্ধুভাবাপন্ন। তাঁরা তাঁদের প্রিয়তম শিক্ষক রাধাকৃষ্ণনের বক্তব্য অমৃতের ন্যায় গিলতেন গোগ্রাসে। তাঁর পাঠদান ছিল এতটাই মর্মস্পর্শী যা তাঁদের হৃদয়কে স্পর্শ করত। এই কলেজেরই তাঁর এক স্নেহধন্য ছাত্র ভি. সীতারামাইয়া নিজের লিখিত— ‘My College Days’ গ্রন্থে বলেছেন, তাঁর পাঠদান ছিল এতটাই পরিশ্রান্তিকর এবং আলোচনা বা বিষয়বস্তু থেকে পাঠ্যবিষয়ের কোনো প্রাসঙ্গিক অংশই বাদ পড়তো না। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উপস্থাপনের জন্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন কৌশল ও রীতি। তাঁর শিক্ষা এমনই পরিপূর্ণ ছিল, ছাত্রদের কোনো কিছু বাইরে থেকে শিখতে হতো না। শ্রেণীকক্ষে তাঁর বক্তব্য শুনেই যে কোনো ছাত্র পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল এতটাই প্রখর যে প্রত্যেক ছাত্রের নাম ও ডাকনাম তিনি জানতেন এবং ডাকনামেই ডাকতেন। ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন একাধারে ‘বন্ধু’ অপরদিকে ‘শিক্ষাগুরু’ ও ‘হৃদয়ের গুরুদেব’।

রাধাকৃষ্ণন ছিলেন ভীষণ রবীন্দ্রানুরাগী। তখনও অবশ্য কবিগুরুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেনি। অথচ তিনি লিখে ফেললেন— ‘দ্য ফিলজফি অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর’ নামে একখানি গ্রন্থ। এ গ্রন্থ রচনার অনেক পরে মহীশূরেই মহারাজা কলেজে অধ্যাপনা করা কালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘটে তাঁর সাক্ষাৎ। অতঃপর ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জির আমন্ত্রণে তিনি যোগ দেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিছুকাল তিনি অধ্যাপনা করেন সিটি কলেজে। এখানেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে বহু জ্ঞানী, গুণী, শিক্ষাবিদ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের। তিনি বন্ধুমহলে স্বীকারও করেছেন যে ঐতিহ্যবাহী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পেরে তিনি ধন্য। তবে মহীশূর ছেড়ে কলকাতায় আসাটা তাঁর কাছে খুব একটা মসৃণ ছিল না। কারণ মহারাজা কলেজের ছাত্র, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক-অধ্যাপক, শিক্ষিত সমাজ ও সাধারণ মানুষ তাঁকে যেতে দিতে নারাজ ছিলেন। অর্থাৎ ‘যেতে নাহি দিব’। আর এ ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হয়, রাধাকৃষ্ণন তাঁদের কাছে কত আপন, কাজের ও কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁদের হার্দিক ভালোবাসা ও আত্মীয়তায় তিনি হয়ে পড়েন বিহ্বল ও বিমূঢ়, কণ্ঠ হয় বাক্‌রুদ্ধ। তবে অনেক বোঝানোর পর তাঁকে যেতে দিতে তাঁরা রাজি হন। তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেন— ‘তবু যেতে দিতে হয়’। সেদিন তাঁরা তাঁদের প্রাণপ্রিয় ও আত্মার আত্মীয় ‘মাস্টারমশাই’কে চোখের জলে ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় দেন। সত্যি, সে এক বিস্ময়কর ঘটনা। ১ মে, ১৯৩৪। তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন উপাচার্য রূপে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈন্যদশা ঘোচাতে তিনি নিয়ে আসেন এক ঝাঁক অধ্যাপককে, যাঁরা স্বক্ষেত্রে স্বনামধন্য। খুলে দেন বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বিভাগ। প্রতিষ্ঠা করেন গ্রন্থাগার। একজন প্রশাসক হিসেবে তিনি ফিরিয়ে আনেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও অনুশাসন।

শিক্ষক হিসেবে রাধাকৃষ্ণনের সুনাম ও পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি ছিল আন্তর্জাতিক স্তরেও। শুধু ভারতবর্ষের মধ্যেই তাঁর শিক্ষাদান সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিনি যোগদান করেন কখনও অধ্যাপক রূপে, আবার কখনও কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তা

হিসেবে। আর এসবের সুবাদেই তিনি হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। তিনি ছিলেন বিভিন্ন দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূতও। বহু মূল্যবান গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তবে তাঁর অবদান শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই ছিল না সীমাবদ্ধ— রাষ্ট্র পরিচালনায়ও তাঁর দক্ষতা ও যোগ্যতা সর্বজনবিদিত। তিনিই ছিলেন ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি। তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন আর এক অধ্যাপক ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ১৯৬২ সলে ভারতের রাষ্ট্রপতিপদ অলঙ্কৃত তিনি করেন। সমগ্র শিক্ষক সমাজের গর্ব একজন শিক্ষক হলেন ভারতের কর্ণধার। শাস্ত্রে আছে, 'বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে।'

রাধাকৃষ্ণন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হলেও, মনে-প্রাণে, রীতি-নীতিতে, নিয়ম-নিষ্ঠায় অবশ্য ছিলেন একজন খাঁটি ভারতীয়। একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তাঁকে এতটুকু প্রভাবিত করতে পারেনি। হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিশ্বাস। কারণ দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক তাঁর কিছু গ্রন্থে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া পোশাক-পরিচ্ছদেও তিনি ছিলেন ষোলো আনা ভারতীয়। তিনি ছিলেন একদিকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষক, পণ্ডিত, বাগ্মী, লেখক, জ্ঞানভিক্ষু, সারস্বত সাধক, ধার্মিক, জাতীয়তাবাদী, সংস্কৃতিমনস্ক, ছাত্রবন্ধু, অন্যদিকে কূটনীতিক, রাষ্ট্রদূত রাষ্ট্রপ্রধান ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের একজন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, দেশপ্রেম এবং রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারত সরকার তাঁকে ১৯৫৪ সালে মর্যাদাপূর্ণ 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন। একজন মানুষের মধ্যে এতসব গুণের সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। সেদিক থেকে বিচার করলে তিনি নিঃসন্দেহে একজন মহামানব। তবে এত পরিচিতির মাঝেও তাঁর বড়ো পরিচয়— তিনি একজন শিক্ষক।

৫ সেপ্টেম্বর। মহান 'শিক্ষক দিবস'। সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনের শুভ জন্মদিন। এই দিনটির একটি সুবিখ্যাত ইতিহাস আছে। সালটা

শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপনে ড. রাধাকৃষ্ণন ও তাঁর ছাত্ররা।

১৯৬২। ড. রাধাকৃষ্ণন তখন ভারতের রাষ্ট্রপতি। তাঁর কিছু প্রিয় ও গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রী ও বন্ধু তাঁর জন্মদিন পালনের অনুরোধ জানালে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর জন্মদিন পালনে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিনটিকে সামগ্রিকভাবে 'শিক্ষক দিবস' রূপে পালনের প্রস্তাব দিলেন। সবাই তাঁর প্রস্তাবে খুশি হন এবং মেনেও নেন সর্বসম্মত ভাবে। সেই সুবাদে মূলত তিনিই 'শিক্ষক দিবস'-এর প্রবর্তক। আর তাঁর এই প্রস্তাব দ্বারা তিনি নিজেকে নয়, শিক্ষক সমাজকেই সম্মানিত ও গৌরবান্বিত করতে চেয়েছেন। করণ তিনি ব্যক্তিপূজার ছিলেন বিরোধী। সত্যি বলতে কী, মহান ব্যক্তিরা কখনই নিজেদের নামে বা স্বার্থে কিছু করেন না, যা কিছু করেন তা পরার্থে— সমাজ ও দেশের স্বার্থে। এ যেন 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'। অর্থাৎ ত্যাগের মধ্য দিয়ে ভোগ। রাধাকৃষ্ণন ছিলেন এমনই একজন মহান ব্যক্তি। ভোগ নয়, ত্যাগই ছিল তাঁর আদর্শ। আর তাইতো 'শিক্ষকদিবস'-এ তিনি এত স্মরণীয় ও বরণীয়। তিনি দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসকের পদে আসীন থাকলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন 'শিক্ষক'। আর এ নির্মম সত্য কথাটা বারবার নিজমুখে স্বীকারও করেছেন তিনি। তিনি জানতেন, শিক্ষকরাই জাতির মেরুদণ্ড, মানুষ গড়ার কারিগর। তাই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পর্বত প্রমাণ। শিক্ষকরা তাঁদের দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালন না করলে সত্যিকারের মানুষ নির্মাণ হবে না। সৃষ্টি হবে মেরুদণ্ডহীন জাতি। উদাহরণ স্বরূপ, দূষিত জলে যত বড়ো শাল-শোলই বাস করুক, অচিরেই তাদের মৃত্যু নিশ্চিত; পক্ষান্তরে, জল বিশুদ্ধ হলে চুনো-পুঁটিরাও সেই জলে দীর্ঘদিন থাকতে পারে বেঁচে। জল ও মাছের মধ্যে যে সম্পর্ক, শিক্ষক- ছাত্রদের মধ্যেও সেই সম্পর্ক। ১৯৬২ সাল থেকে সরকারি ভাবে চালু হওয়া এই 'শিক্ষক দিবস'— দেশের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক তথা আপমর জনগণ প্রতিবছরই যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আসছেন। আবার এই মহান ও পবিত্র দিনটিতে সরকারও শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের 'জাতীয় শিক্ষক'-এর সম্মানে ভূষিত করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে UNESCO-র 'শিক্ষক দিবস'-এর স্বীকৃতি। প্রতি বছরই এই দিনটিতে স্কুলে স্কুলে তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকরা সম্মিলিতভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে থাকেন শিক্ষক দিবস। আর এর উদ্যোক্তা মূলত ছাত্ররাই। আলোচনা সভা হয়। ড. রাধাকৃষ্ণনকে স্মরণ ও মনন করা হয়। ছাত্রদের অনেকেই প্রিয় শিক্ষকদের হাতে উপহার তুলে দেন। শিক্ষকরাও ধন্য ও কৃতার্থ হন। তবে ড. রাধাকৃষ্ণনের স্বপ্ন যেদিন সফল হবে, সেদিন শিক্ষক দিবস পালন সার্থক হবে। ■

নতুন ঠিকানা

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন কার্তিক মাসের মাঝামাঝি। গরমটা একটু কম আছে আর এই সময় তো ঠাণ্ডার দেখা পাওয়া যায় না। এইরকম এক সময় সকালবেলায় প্রশান্ত বাড়ির বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। পনেরো দিন হলো ওর স্ত্রী অসীমার পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেছে। দেওয়ালে টাঙানো অসীমার ছবিতে রজনীগন্ধার মালাটা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। এখনো খোলা হয়নি। প্রশান্ত পাশে রাখা মোবাইল ফোনটা তুলে আনমনে সার্ফ করতে থাকে। ওর অফিসের প্রাক্তন সহকর্মী অম্বর মুখার্জি একটা শোকবার্তা পাঠিয়েছে, সঙ্গে একটা কোটেশনও, 'Don't grieve. Anything you lose comes round in another form' প্রশান্ত চোখ বুজে চিন্তা করতে থাকে কোটেশনটা কার খলিল জিব্রান না রুমির। ঠিক মনে করতে পারলো না। এমন সময় ওদের কাজের বউ চম্পা এসে এক কাপ চা, দুটো বিস্কুট আর খবরের কাগজটা হাতে দিয়ে চলে গেল। চম্পা আগে ঠিকে কাজ করতো। এখন অন্যবাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়ে শুধু এখানেই সারাদিন কাজকর্ম, রান্নাবান্না ইত্যাদি করে। অসীমা চলে যাবার পর ওর মেয়ে সুদীপ্তাই কথা বলে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে। তার জন্য অবশ্য চম্পাকে একটু বেশি মাইনে দিতে হয়। প্রশান্ত চা-বিস্কুট খেয়ে খবরের কাগজটা খুলে হেডলাইনগুলোর ওপর চোখ বোলাতে লাগল। কিছুক্ষণ কাগজটা দেখে ভাঁজ করে পাশের ছোটো টেবিলটায় রেখে আবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকজনের চলাচল, গাড়িঘোড়ার ছুটোছুটি, হর্নের আওয়াজ এইসব দেখতে দেখতে সময় কাটে। কিছুক্ষণ পর একটা শববাহী যান রাস্তা দিয়ে চলে গেল। আগে হলে তার বুকের ভেতরটা কীরকম ধক্ করে উঠতো। এখন আর কোনো অনুভূতিই হলো না।

এমন সময় চৌধুরীপাড়ার অমিয় যেতে যেতে তাকে দেখে হঠাৎ সামনের গেট খুলে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, 'প্রশান্তদা, স্যাড নিউজটা গতকালই পেলাম। শুনে খুব খারাপ লাগল। কী হয়েছিল বৌদির?' প্রশান্ত বলে, 'কী আর বলব অমিয়, যেন আচমকা একটা ঝড়ের ধাক্কায় সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। তোমার বৌদির একটা অভ্যাস ছিল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়া। সেদিনও যথারীতি কাগজ নিয়ে বসেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কাগজটা ফেলে সটান সোফার ওপর শুয়ে পড়ল। তারপর দেখি কেমন করছে। আমি কাছে গিয়ে বললাম, 'কী হলো গো?' দেখি কী একটা বলতে চাইছে কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছে না। পাশের বাড়ি বিশুকে

ডাকতেই বিশু এবং ওর বৌ ছুটে এল। ওরা সব দেখে বলে দাদা সুবিধার বুঝছি না, আপনি এখুনি একজন ডাক্তার নিয়ে আসুন। আমি আর বিশু ডা: সুবীর চ্যাটার্জির চেম্বারের দিকে যাচ্ছি। দেখি তিনি তখন চেম্বার বন্ধ করে মোটরবাইকে স্টার্ট দিয়ে বাড়ি যাবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমরা বলতেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে চলে এলেন। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, পায়ের তলায় কী একটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখলেন। তারপর বললেন, 'একটা অ্যাটাক হয়ে গেছে। ইমিডিয়েটলি হসপিটালাইজ করুন।' এই বলে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে চলে গেলেন। তখন আমার ভাইপোদের খবর দিলাম। তারা কিছুক্ষণ পরই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে হাজির হলো। সেদিনই মেডিল্যান্ডে ভর্তি করালাম। তারা সঙ্গে সঙ্গে আইসিইউতে নিয়ে গেল। পরদিন ডাক্তারবাবু বললেন, অবস্থা বেশ সিরিয়াস হয়ে গেছে, আপাতত বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাবে না। আমার ছেলে গৌতম, মেয়ে সুদীপ্তা মানে খুকিকে খবর পাঠালাম। পরদিনের ফ্লাইটে সবাই হাজির হলো। কয়েকদিন যমে-মানুষে টানাটানি চললো। পাঁচদিনের দিন রাত দুটোয় সব শেষ। আমি বড়ো একা হয়ে গেলাম হে অমিয়।' অমিয় কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে বলে, 'সবই কপাল, কী আর করবেন বলুন প্রশান্তদা।'

প্রশান্ত বলে ওঠে, 'এইরে তোমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ভেতরে এস।'

অমিয় বলে, 'না দাদা আজ আর যাব না। এখন বাজারে যেতে হবে বাড়িতে গেস্ট এসেছে, পরে একদিন আসবো।'

বেলা বাড়তে থাকে। রোদ্দুরটা ক্রমশ চড়া হতে শুরু করে। চম্পা হাঁক পাড়ে, 'জেঠু জলখাবার দিয়েছি চলে আসুন।' প্রশান্ত আস্তে আস্তে উঠে ডাইনিং টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

জলখাবার খাওয়ার পর ইদানীং কীরকম একটা ঝিমুনি ভাব আসে। দোতলায় ঘরে গিয়ে খাটের ওপর বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দেয়। ঘুমে দুচোখ বুজে আসে। স্বপ্নে অসীমা দেখা দেয়। হাসি মুখে বলছে, কীগো পুরীর টিকিটটা কাটিয়েছ?' ঘুম ভেঙে যায়, ধড়ফড় করে বিছানা থেকে উঠে বসে। ওদের এবার পুজোর পর পুরী যাবার কথা ছিল। স্থানুর মতো বিছানায় বসে আকাশ-পাতাল কী ভাবে সে।

আরও একটু বেলা হতেই চম্পা বলে, 'জেঠু এবার দরজাটা দিয়ে দিন। আমি চলে যাচ্ছি। সময়মতো চান-খাওয়া করে নেবেন। আবার বিকালে আসবো।'

প্রশান্ত দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তারপর অসীমার ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে স্থির হয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে বলে, 'তুমি কেমন আছ অসীমা? আমি ভালো নেই।'

কিছুক্ষণ পরে বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে নেয়। ঠাকুর ঘরে গিয়ে প্রথমে ঠাকুরদেবতাদের ছবি আর মূর্তিগুলি পরিষ্কার করে। তারপর ধূপ জ্বালিয়ে কিছু সময় পুজো আর জপধ্যানে ব্যয় করে। ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে কাচা জামা-কাপড় পরে খেতে বসে, খাওয়া শেষ হলে থালা-বাসনগুলো রান্নাঘরে রেখে টেবিল পরিষ্কার করে। এরপর হাত-মুখ ধুয়ে মুছে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায়। কিছুক্ষণ আনমনা ভাবে এঘর ওঘর বারান্দায় পায়চারি করে শোবার ঘরে আলমারিটার সামনে দাঁড়ায়। আলমারির গায়ে লাগানো আয়নাটার দিকে চোখ রাখে। অধিকাংশ চুল সাদা হয়ে গেছে। কপালে বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। তাহলে কি এবার সে সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছে! মনে হয় যেন এইতো সেদিনকার কথা। কলকাতা ময়দানে তখন সে নিয়মিত ক্রিকেট খেলত। একটা ম্যাচে পাঁচ উইকেট পেয়েছিল। রণজি ট্রফির দলগঠনের ট্রায়ালে ডাকও পেয়েছিল। কোচ ভানুদা পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'তুই বাঙ্গলা দলে চান্স পাবি।'

দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেল। মাথার চুলের ভেতর আঙুল বুলিয়ে যায় সে। এখন বুড়ো হয়ে গেছে। চাবিটা দিয়ে আলমারি খোলে। থরে থরে অসীমার শাড়িগুলো সাজানো আছে। অসীমা বলতো, 'তোমার বন্ধুরা বউদের কত দামী দামী শাড়ি কিনে দেয়। তুমি হাড়কিপ্‌টে, একদম খরচ করতে চাও না।' প্রশান্তর মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। আস্তে আস্তে আলমারিটা বন্ধ করে দেয় সে। এবার সে বিছানায় বসে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে দেখা যায় একটা নিঃসঙ্গ নারকোল গাছ। স্থির হয়ে আছে। এখন এই দুপুরবেলা যখন সূর্য মধ্যাহ্নগগনে বিরাজ করে প্রখর কিরণ ছড়িয়ে দেয়, চারদিকের চেনাজানা শব্দগুলো ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। শুধু শোনা যায় কাকেদের চিৎকার। আর মাঝে মধ্যে যানবাহনের হর্নের আওয়াজ। প্রশান্তর চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে, কখন অজান্তে চলে যায় নিদ্রার গভীরে।

সন্ধ্যা নামে। হঠাৎ কলিংবেলের শব্দ ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় প্রশান্তর। এখন চম্পা এসেছে। নীচে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। চম্পা রান্নাঘরের দিকে চলে যায়। প্রশান্ত বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ে। কিছুক্ষণ পর চম্পা চা দিয়ে যায়। চা খেয়ে বিকালের দিকে সে ছাদে চলে যায়। চম্পা বলে, 'জেঠু এই সময় তো একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারেন, পার্কে যেতে পারেন, তাহলে মনটা একটু হালকা হবে। সারাক্ষণ তো শুধু বাড়িতে থাকেন। প্রশান্ত কিছু বলে না, মৃদু হাসে।

ছাদে উঠে সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। দেখে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া বিভিন্ন মানুষজনকে। দূরে একটা স্টেশনারি দোকানের সাইনবোর্ডে ছোটো ছোটো লাল, নীল আলোর টুনিবাল্বগুলো ঝিক্‌মিক্ করে জ্বলছে নিবছে। সাইকেল, রিকশা আর মোটরবাইকের ব্যস্ত আনাগোনা। তার মনে হয় পৃথিবীতে সবকিছু তাদের নিজেদের জায়গায় ঠিক্‌ঠাক আছে। নেই শুধু অসীমা। হঠাৎ

অনেক দূর থেকে ভেসে আসে সানাইয়ের সুর। তার মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। বৌভাতের দিনটার কথা মনে পড়ে। রাত্রিবেলায় সানাইয়ের সুরের মূর্ছনায় চারদিক গমগম করছে। আলোয় ঝলমল করছে চারপাশ। একদিকে চলছে খাওয়া-দাওয়া। বাবা-কাকারা সব তদারক করছেন। অফিসের এক মহিলা সহকর্মীর সঙ্গে নববধূ অসীমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় পাশ থেকে আর এক সহকর্মী বীরেন মন্তব্য করে ওঠে, জানেন বৌদি এরা সবসময় একসঙ্গে থাকে এখন দেখুন আপনি এদের আলাদা করতে পারেন কিনা। সমবেত সবাই হেসে ওঠে। অসীমার মুখেও মৃদু, হাসি।

মনে হয় দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পায়চারি করে সে নীচে নেমে আসে। বাথরুমে গিয়ে হাত-পা-মুখ ধুয়ে একটা কাচা ধুতি পরে ঠাকুরঘরে ঢোকে। চারদিকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে, ধূপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করে। নিয়মিত সন্ধ্যা দেওয়ার কাজটা অসীমা করত এখন প্রশান্তর পালা। আগে এই সময় সে টিভিটা খুলে নিউজ দেখে বাড়ির বাইরে চলে যেত কারণ তারপর রিমোটের দায়িত্ব চলে যেত অসীমার হাতে, একের পর এক সিরিয়াল উপভোগ করত সে।

এখন প্রশান্ত দোতলার বারান্দায় চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে। হালকা কিছু খায়। এমন সময় মোবাইলটা বেজে ওঠে। ছেলে গৌতম ফোন করেছে। শরীর কেমন আছে জিজাসা করে, তারপর কিছু পারিবারিক বিষয় আলোচনা হয়। কথা শেষ করে ফোনটা রেখে দেয় সে। গৌতম এখন বাঙ্গালোরে থাকে। একটা বহুজাতিক সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। শহরের অভিজাত এলাকায় থাকে। নিজের গাড়ি আছে। অসীমার প্রয়াণের পর প্রশান্তকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পূর্বপুরুষের ভিটের মায়া কাটিয়ে সে যেতে চায়নি। আধঘণ্টা পরে মোবাইলটা আবার সরব হয়ে হয়ে ওঠে। প্রশান্ত ফোনটা কানে ঠেকিয়ে বলে, হ্যাঁ খুকি বল। মেয়ে সুদীপ্তা বাবার জন্য উদ্বিগ্ন থাকে। প্রায় রোজই ফোন করে শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর করে। তাতেও শান্তি পায় না চম্পাকে আলাদা করে ফোন করে সবকিছু জিজ্ঞাসা করে।

একটু রাত হলে চম্পা হাঁক পাড়ে, 'জেঠু দরজাটা দিয়ে দিন, চলে যাচ্ছি। টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া রইল। দরজাটা বন্ধ করে প্রশান্ত দোতলার বারান্দায় গিয়ে বসে। বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দেয়। সে এখন এইরকম অন্ধকারে বসে থাকতেই পছন্দ করে। দেখে, দূরে একটা বাড়িতে একটা ছেলে দুলে দুলে চিৎকার করে পড়ে যাচ্ছে। মনে আসে ছোটোবেলাকার কথা। তখন বাবা-কাকা-জ্যাঠা- জ্যাঠাইমাদের নিয়ে ভরা যৌথ সংসার। রান্নাঘরে দুটো মাটির উনুন গনগন করে জ্বলছে। একটাতে তরকারি, অন্যটায় ভাত ফুটছে। মা, কাকিমা, জ্যাঠাইমারা কেউ রান্নায়, কেউ সব্জি কুটছে, কেউবা বড়ো একটা শিলে বাটনা বাটছে। ওদিকে চিলেকোঠার ঘরে বড়দা চিল চিৎকার করে পড়ে যাচ্ছে, 'ওয়ান মর্ন আই মেট এ লেম ম্যান।'

সদর ঘরে গালছে পাতা হয়েছে। গানের আসর বসেছে। বাবা চোখ বুজে হারমোনিয়ামে সুর তুলছেন, বাবাকে ঘিরে তব্‌লা , বাঁশি, তানপুরা ইত্যাদি নিয়ে ঘেরে বসে আছে বাদ্যযন্ত্রীরা, যদিও তারা বাবারই বন্ধুস্থানীয়। কিছুক্ষণ পর বাবা গেয়ে উঠলেন, 'ক্যায়া করুঁ সজনি আয়ে না বালম্‌।' তার সঙ্গে তবলা, তানপুরা ও বাঁশির সুরের মূর্ছনায় চারপাশ গম্‌ গম্‌ করতে লাগল।

প্রশান্ত চোখে বুজে শুধু ভাবতে থাকে সেইসব হারানো দিনগুলোর কথা। রাত দশটার সময় রাতের খাওয়া শেষ করে নেয় সে। এরপর আবার বারান্দায়, ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ এলোমেলো পায়চারি করে। কিছুক্ষণ বাদে ফ্যানটা ফুল স্পিডে চালিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে। ঘুম আসে না। এপাশ ওপাশ করে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে একটা উড়োজাহাজ অন্ধকার আকাশের বুকে ভেসে চলে যায়। তার লালনীল আলোগুলো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে নিভ্‌ছে। আরও অনেকক্ষণ পরে ঘুম আসে চোখে। মাঝরাতে স্বপ্ন দেখে যে সে একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। ছেলে গৌতম, মেয়ে সুদীপ্তা দরজা দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে চলে গেল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই একবার করে দেখে চলে যাচ্ছে। তারপর একা, একদম একা। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করে কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আজওয়াজ বেরোয় না। ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড় করে উড়ে বসে। তারপর আস্তে আস্তে বেসিনে গিয়ে হাতে মুখে, ঘাড়ে জল দিয়ে কিছুটা ধাতস্থ হয়। এরপর চেয়ারে বসে পড়ে। এমন সময় একটা রাতচরা কালপেঁচা বিশ্রীরকম আওয়াজ করতে করতে ছাদের উপর দিয়ে উঠে চলে গেল। সে চমকে ওঠে। হঠাৎ জীবনানন্দ দাশের কবিতার কয়েকটা লাইন মনের মধ্যে জেগে ওঠে।

''আমার মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা, সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেওয়ালের মতো এসে জাগে, ধূসর মৃত্যুর মুখ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল— সোনা ছিল যাহা নিরুত্তর শান্তি পায়; যেন কোনো মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।''

একটা কাগজ আর পেন নিয়ে নেয় সে। লিখতে থাকে— 'অনেকদিন হলো পৃথিবীতে এসেছি। আরও অনেকদিন থাকতে হলে জরা-ব্যাধিগ্রস্থ হয়ে কারো ওপর নির্ভর করে থাকতে হবে। আমি কারো বোঝা হয়ে থাকতে চাই না। তাই স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চললাম। বিদায়।' সে এবার ঘূর্ণায়মান সিলিং ফ্যানটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পরদিন চম্পা এসে কলিং বেল বাজায়। বেশ কিছুক্ষণ পর প্রশান্ত দরজা খোলে। চম্পা অভ্যাসমতো নিজের কাজ শুরু করে দেয়। প্রশান্ত বারান্দায় চেয়ারের ওপর ঝিম্‌ হয়ে বসে থাকে। চম্পা কাজের ফাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'কী জেঠু আজ এত চুপচাপ, ব্যাপার কি— শরীর খারাপ

নাকি?'

প্রশান্ত বলে, না, তেমন কিছু না।

চম্পা আবার বলে, কিছু চেপে যাচ্ছেন না তো?

প্রশান্ত বলে, না রে না।

পাশে রাখা মোবাইলটা তুলে নিয়ে দেখে পরপর দুটো মিস্‌ড কল। অজানা নম্বর থেকে। প্রশান্ত রিং ব্যাক করে ফোন করে। অন্য প্রান্ত থেকে এক মহিলা কণ্ঠ রিনরিনে গলায় বলে ওঠে। হ্যালো। প্রশান্ত বলে, এই নাম্বার থেকে দুটো মিস্‌ড কল এসেছে আমার ফোনে। অন্যপ্রান্তের মহিলা তখন উচ্ছ্বসিত গলায় বলে ওঠে, 'প্রশান্ত চিনতে পারছ, আমি অনুপমা বলছি।

প্রশান্ত বলে, কোন অনুপমা?

আরে চিনতে পারছ না কলেজে একসঙ্গে পড়েছি, তারপর রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট্‌সে দুবছর...।

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ— এবার বুঝতে পেরেছি। ওঃ, বহুযুগের ওপার হতে তোমার কণ্ঠস্বর ভেসে এল। তুমি তো ফরেনে ছিলে না?

—হ্যাঁ, সেসব পর্ব চুকে গেছে। এখন এখানেই সেট্‌লড্‌।

—তুমি আমার ফোন নাম্বার পেলে কোথা থেকে?

—চঞ্চল অ্যাপস্‌-এ তোমার খবর জানালো। আর তোমার এই স্যাড নিউজটাও বললে। প্রশান্ত বলে, আচ্ছা।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলে, 'অনুপমা তোমার খবর কী? তোমার হাজব্যান্ড জয় কেমন আছে?

—ওর সঙ্গে সেপারেশন হয়ে গেছে বহুকাল আগে। প্রশান্ত বলে, আর পারিবারিক জীবনের কোনো—

—নাঃ ওসব চক্করে আর নেই। এরপর অনুপমা বলে, ওসব কথা এখন থাক প্রশান্ত।

আগামীকাল বিকালে তোমার বাড়ি যাব। ওই সময় তুমি কি ফ্রি আছ?

প্রশান্ত বলে, হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই।

—তাহলে তোমার বাড়ির ল্যান্ডমার্কটা বলো।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ও ফোনটা রেখে দিলে।

অনুপমা বড়োলোকের মেয়ে। কথাবার্তা চালচলনে একটা আভিজাত্য প্রকাশ পেত। কিন্তু সবার সঙ্গে মেলামেশা করবার একটা ক্ষমতা ছিল। ওর নিজস্ব একটা গাড়ি ছিল। সেই গাড়ি চালিয়ে কলেজে তারপর অফিসেও আসত। সে বহুকাল আগেকার কথা।

পরদিন পাঁচটার সময় টুং ট্যাং করে কলিং বেলটা বাজল। কিছুক্ষণ পর চম্পার উচ্চকিত কণ্ঠস্বর জেঠু আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।'

প্রশান্ত দরজার সামনে এসে দেখে অনুপমা দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ সময় পার করেও গোধূলির অস্তায়মান সূর্যের অনুজ্জ্বল কিরণের স্নিগ্ধতা এখন ওর সৌন্দর্যে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। দেখে মনে হয় নিয়মিত পার্লারে যায়। বেশ কিছু কেশরাশি লাল রঙে রাঙানো। পরনে সাদা রঙের সালোয়ার কামিজ, হালকা একটা পারফিউমের গন্ধ ভেসে আসছে। প্রশান্ত মৃদু হেসে বলে, এস অনুপমা। অনুপমা ভেতরে প্রবেশ করে। প্রশান্ত বলে, অনুপমা কতকাল পর আবার তোমার সঙ্গে দেখা হলো বল তো। কুড়ি-পঁচিশ বছর পর হবে। অনুপমা বলে, তা হবে হয়ত। এরপর ওরা দেওয়ালে টাঙানো অসীমার ছবির সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রশান্তি বলে, একটা ঝড় যেন আমার সবকিছু ওলট-পালোট করে দিয়ে চলে গেল। বড়ো একা হয়ে গেলাম অনুপমা।'

অনুপমা বলে, কী আর বলবো বলো। এসবের কোনো সান্ত্বনা হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে সব সামলে যাবে।' এরপর অনুপমা ব্যাগ থেকে একটা রজনীগন্ধার মালা বার করে প্রশান্তর হাতে দিল। প্রশান্ত বলে, 'পরে এটা ছবিতে টাঙিয়ে দেবো।' এরপর ওরা দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার ঘরে গিয়ে বসে। দুটো চেয়ার নিয়ে মুখোমুখি দুজনে। এবার প্রশান্ত বলে, 'বলো অনুপমা তোমার খবর কী? এখন কি করছ?

অনুপমা বলে— প্রথমে তো জার্মানি গেলাম জান তো। সেখানে বেশ কিছুকাল কাটিয়ে পেলাম কানাডা, তারপর ইউ এস এতে বেশ লং পিরিয়ড কাটিয়ে এখন ক্যালকাটায় সেটলড্‌। একই কথাগুলি বলার পর অনুপমা হাসে।

প্রশান্ত বলে— 'একেবারে গ্লোবাল সিটিজেন।'

মৃদু হেসে অনুপমা বলে— 'তা বলতে পারো।'

প্রশান্ত বলে, দাঁড়াও তোমার জন্য কফি বানিয়ে নিয়ে আসি। এই বলে প্রশান্ত রান্নাঘরে প্রবেশ করে। ওর পিছনে অনুপমাও আসে।

প্রশান্ত কফি তৈরি করতে করতে বলে, 'মনে আছে অনুপমা, রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট্‌সে থাকাকালীন তুমি আমাকে কিচেনে নিয়ে গিয়ে কফি তৈরি করা শিখিয়েছিলে। আর তুমি স্ট্রং কফি খেতে, ঠিক না? অনুপমা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়।

ওরা আবার ঘরে এসে দুজনে দু'কাপ কফি নিয়ে খেতে খেতে গল্প করে।

অনুপমা বলে, 'প্রশান্ত তোমার এবার নেক্সট্‌ প্ল্যান কী?'

প্রশান্ত বলে, 'আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে নেই। এবার সোজা ওপরে চলে যাওয়া।'

অনুপমা বলে, কেন?

প্রশান্ত বলে, 'দ্যাখো অনুপমা, ছেলেকে ভালোভাবে মানুষ করেছি ও ভালোভাবেই সেটলড্‌ হয়েছে। বিয়ে-থা দিয়ে সংসারী করে দিয়েছি। মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভালো পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। ও এখন সুখী। আমার সমস্ত সাংসারিক কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। অসীমাও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। এরপর যত বয়স বাড়বে নানারকম রোগে শরীর জর্জরিত হবে। আস্তে আস্তে কারো ওপর নির্ভরশীল হয়ে বোঝার মতো হয়ে যাবো। তাই সুস্থ থাকতে থাকতে চলে যাওয়াই ভালো।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে প্রশান্ত এবার থামে।

অনুপমা বলে, তা কেন? তাপরও তো মানুষের করণীয় অনেক কিছু থাকে। আর শরীর-স্বাস্থ্যের কথা বলছ। সেতো মানুষের যে কোনো বয়সেই শরীর ভেঙে যেতে পারে। আবার অনেক মানুষ প্রবীণ বয়সেও অ্যাকটিভ থেকে নানা কাজকর্মে ইনভলভড্ থাকে।'

প্রশান্ত বলে, 'তা হয়তো ঠিক। তবে আমায় মনে হয় এই পৃথিবীটা বেশি বয়স অবধি বেঁচে থাকার জন্য আদর্শ জায়গা নয়।

অনুপমা বলে, 'এটা তুমি কী দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখছ তার উপর নির্ভর করে। দ্যাখো, আমিও একসময় টাকা-পয়সা, গ্ল্যামারের পেছনে পাগলের মতো দৌড়েছি। মনে হতো জীবনে বুঝি এটাই সব। কিন্তু এখন আমার নানা ঘটনাক্রমে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে গেছে। এখন ভাবি ওগুলো সব নয়। জীবনের আরও একটা দিক আছে।'

প্রশান্ত অবাক হয়ে বলে, 'কীরকম?'

অনুপমা বলে, 'দারিদ্র্য যেমন মানুষকে দুঃখ দেয়, হতাশ করে, তেমনি প্রাচুর্যও কখনো কখনো মানুষের মনে বিষাদ আনে, তাকে নিঃসঙ্গ করে দেয়। আমি যখন ইউ এস এ থেকে ফিরলাম তখন মনে হলো আমার আর্থিক প্রাচুর্য যথেষ্ট আছে, সমস্ত ভোগবাসনারও পরিতৃপ্তি হয়ে গেছে। আর কী চাই? বয়সও অনেকটা বেড়ে গেছে। এবার কোন পথে যাবো? ভাবতে ভাবতে ক্রমশই হতাশ হয়ে আসছি। তখন একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন বন্ধু একসঙ্গে জড়ো হয়ে একটা সংস্থা তৈরি করি। যত আন্‌ক্লেমড্ বেবি বা যারা গোপনে সন্তানদের জন্ম দিয়ে তাদের ফেলে চলে গেছে; সেইসব অসহায় শিশুদের পরিচর্যা বা লালনপালন করবার জন্য একটা জায়গা ঠিক করি নর্থ চব্বিশ পরগনার একটা গ্রামের মধ্যে। আমাদের অর্গানাইজেশনের নাম 'নতুন ঠিকানা'। খুব ছোটো করেই শুরু করেছিলাম। তারপর বিদেশে আমার পরিচিতদের সাহায্যে এটা এখন মোটামুটিভাবে চলছে।'

প্রশান্ত বলে, বাঃ ভেরি গুড এফর্ট।

অনুপমা বলে, 'আমার এইসব অসহায় শিশুদের নার্সিং করতে ভালোই লাগে। আমি প্রায় বেশিরভাগ সময় ওখানেই কাটাই। তুমি যদি যাও আশাকরি তোমারও ভালো লাগবে। তুমি যাবে একদিন?

প্রশান্ত বলে, দেখা যাক্। অনুপমা বলে, 'দেখা যাক্ নয়, সামনের রবিবার বিকালবেলা আমি আবার আসবো। তোমাকে ওখানে নিয়ে যাবো, কেমন?

প্রশান্ত হেসে বলে, অগত্যা।

ওরা আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে সময় অতিবাহিত করবার পর অনুপমা বলে, আমি এবার উঠি। অনুপমা দাঁড়িয়ে উঠে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। ওর পেছনে পেছনে প্রশান্ত প্রধান দরজা পর্যন্ত এসে বিদায় জানায়। অনুপমা বলে, 'তাহলে ওই কথাই রইল। আগামী রবিবার বিকেল বেলায়। প্রশান্ত বলে, ওকে।

পরের রবিবার বিকালবেলায় অনুপমা প্রশান্তকে ফোন করে বলে, 'তোমার বাড়ির কাছে বাপী স্টোর্সের সামনে গাড়িটা পার্ক করে তোমার বাড়ি আসছি।'

প্রশান্ত বলে বাড়ির প্রধান দরজার জন্য তালাচাবিটা চম্পার হাতে দিয়ে বলে, যাবার সময় দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা বিশুদের বাড়ি দিয়ে যাস। আমি ওখান থেকেই চাবিটা নিয়ে নেবো। আজ আমার ফিরতে রাত হবে।'

চম্পা বলে ঠিক আছে।

রাস্তায় বেরিয়ে প্রশান্ত দেখে উল্টোদিক থেকে অনুপমা হনহন করে হেঁটে আসছে। তার সযত্নলালিত কেশরাশি হাওয়ায় উড়ছে। শরীরের মধ্যে পড়ন্ত যৌবনের স্নিগ্ধতা বিরাজ করে। প্রশান্তকে দেখে বলে ওঠে, গুড ইভনিং। প্রশান্তও পালটা উইশ করে। এরপর ওরা গাড়িতে গিয়ে ওঠে। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেয়। প্রশান্ত বলে, অনুপমা ভিনটেজ ওয়াইনের মতো যত দিন যাচ্ছে ততই তুমি ফ্রেশ হয়ে উঠছ।'

অনুপমা খিলখিল করে হেসে ওঠে, তারপর বলে, থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইয়োর কমপ্লিমেন্ট।'

এরপর অনুপমা বলতে শুরু করে, 'জানো প্রশান্ত এই প্রজেক্টটা যখন প্রথম শুরু করি তখন কত চাইল্ডলেস কাপল আমার কাছে আসত বেবি অ্যাডপ্ট করবার জন্য। কিন্তু আমি রাজি হইনি। কেননা এর মধ্যে অনেক গলতা আছে। এই ফাঁকে কেউ চাইল্ড ট্র্যাফিকিং করতে পারে বা কেউ অ্যাডপ্ট করার নাম করে অন্যকিছু করতে পারে। তাই আমি কোনো বেবী কারোকে দিইনি। উপরন্তু এই হোমে যথেষ্ট সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেছি যাতে কেউ বেবি চুরি না করতে পারে। এছাড়াও আমি ওদের জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছি, বেশ কিছু ট্রেনড ফিমেল অ্যাটেনডেন্ট রেখেছি। জানো কয়েক বছর আগে একজন রাস্তায় ড্রেনের ধারে একটা নিউবর্ন বেবিকে ফেলে যায়। আমরা তাকে নিয়ে আমি, হসপিটালাইজড্ করি। কিন্তু এত ইনফেকশন হয়ে গিয়েছিল যে চারমাস পরে ও মারা গেল। কি কিউট দেখতে ছিল। এবার অনুপমা থামে। ওর চোখটা ছলছল করে ওঠে।

প্রশান্ত বলে, তোমরা সত্যিই একটা প্রশংসনীয় কাজ করেছ।

অনুপমা বলে, 'আমি এর মধ্যে অপার শান্তি পেয়েছি। এই দীর্ঘ জীবনে অনেক কিছু পেলাম, আবার অনেক কিছুই হারালাম। এবার আমি এই জগৎটাকে সবকিছু ফিরিয়ে দিতে চাই।

ওদের এই কথপোকথনের মধ্যে গাড়িটা হাইওয়েতে উঠে দ্রুত গতি বাড়ায়। গাছপালার সারি, সবুজ প্রান্তর, বাড়িঘর, দ্রুত পিছনে চলে যায়।

নীল আকাশের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ আলোমেঘ ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। এক ঝাঁক বকের সারি বিচিত্র ছন্দোবদ্ধ আকার ধারণ করে উড়ে চলে দূর কোনো দিগন্তের পানে। এলোমেলো বাতাস স্নিগ্ধ করে দেয় চারপাশ। ওরা এগিয়ে চলে নতুন ঠিকানার দিকে। ■

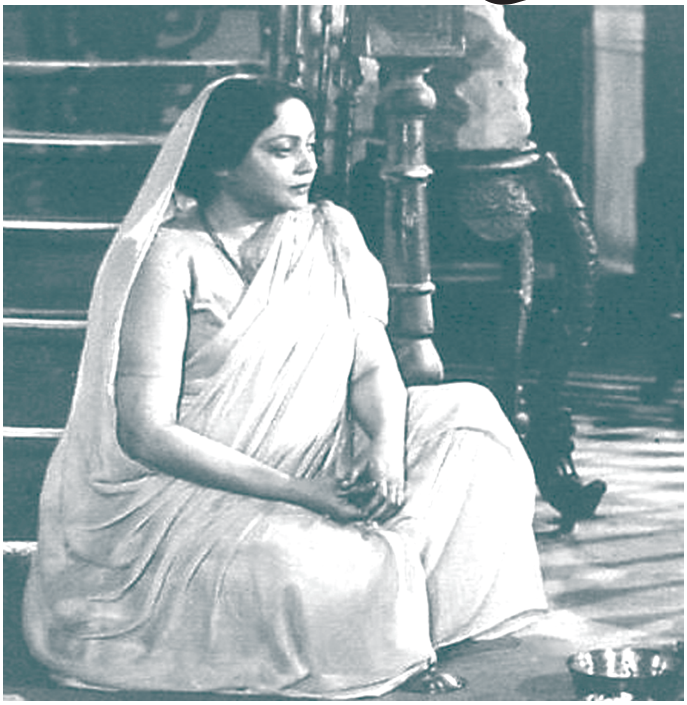

অমলিন হাস্যমুখী মাতৃমূর্তি
মলিনা দেবী

রূপশ্রী দত্ত

'মলিনা দেবী' বললেই এক চিরন্তন মাতৃমূর্তির ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। স্নেহময়ী, হাস্যমুখী, পরনে লালপাড় সাদা শাড়ি— দর্শকমনে মলিনার ভাবমূর্তি এইরকমই। মলিনাকে পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকাভিনেত্রী চিরন্তনী জননীরূপেই দর্শক মনে রেখেছেন। তাঁর সংলাপের মধ্যেও যেন স্নেহচ্ছটা ঝরে পড়ত। তখনকার একটি ছবিতে বলা মলিনার একটি সংলাপ— যা তিনি ছবিতে তাঁর স্নেহাস্পদকে বলেছিলেন— 'অসুখ করবে যে। গায়ে গরম জামা দে।' —দর্শকদের মুখে মুখে ফিরত, অবিকল তাঁর ভঙ্গিটি অনুকরণ করে।

মলিনার প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত কথা বলার প্রবণতা সংবরণ করতে পারছি না। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, আমার বাল্যকালে একদিন, বাবা, মা, আমি ও আমার ছোটোবোন ধর্মতলায় 'কমলালয় স্টোর্স' নামক অধুনালুপ্ত বিভাগীয় বিপণিতে জিনিস কিনতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সবিস্ময়ে দেখলাম সেই চিরন্তনী মাতৃমূর্তি মাথায় ঘোমটাটানা লালপাড় সাদা শাড়ি পরনে মলিনা, দোকানের দরজা দিয়ে ঢুকছেন। সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় স্বামী বিখ্যাত অভিনেতা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা বিস্মিত, রোমাঞ্চিত। তাঁরা আমাদের পাশ দিয়ে গেলেন, আমার ছোটো বোন যাবার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল। মৃদু হেসে তাকে আলতো হাতে সরিয়ে দিয়ে, মলিনা এগিয়ে গেলেন, মহারানির মতো সগৌরবে। মলিনা তো বটেই, তখনকার অন্যান্য বিখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীদেরও মাঝে মাঝে জনসাধারণের সঙ্গে দেখা যেত।

মলিনা দেবী (১৯১৬—১৩ আগস্ট, ১৯৭৭) বিখ্যাত চিত্র ও মঞ্চ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শিক্ষানবিশী শুরু করেন। আট বছর বয়সে প্রথম একটি নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেন। সেই সময় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ছবিতে নর্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর ভাবমূর্তির সম্পূর্ণ বিপরীত, খলনায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ১৯৩৯ সালে প্রমথেশ বড়ুয়ার 'রজতজয়ন্তী' ছবিতে। মলিনা 'রঙ্গনা' মঞ্চের মুখ্য অভিনয়শিল্পী ছিলেন। মহিলা শিল্পী সংসদ গড়তে তিনি আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন।

মঞ্চে অভিনয়ের জন্য তিনি 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি' পুরস্কার পেয়েছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি এম জি এন্টারপ্রাইজ নামে এক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। ভক্তিমূলক ছবির বাণিজ্যিক প্রদর্শনে, এই সংগঠনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

মলিনাদেবী অভিনীত ছবির মধ্যে, 'বড়দিদি', 'মাটির ঘর', 'মানে না মানা', 'রামের সুমতি', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'নীলাচলে মহাপ্রভু', 'ইন্দ্রনাথ', 'শ্রীকান্ত ও অন্নদাদিদি', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'মাইকেল মধুসূদন' ও 'রানি রাসমণি', 'সাড়ে চুয়াত্তর' উল্লেখযোগ্য।

আজকের যুগে 'বায়োপিক' কথাটার প্রচলন হয়েছে। তখন হয়নি। আসলে তা 'জীবনী চিত্র'। 'রানি রাসমণি' মলিনার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছবি। রাসমণির 'বায়োপিক' মলিনাদেবী অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গে এসেছে অধিকাংশ সময় রামকৃষ্ণের ভূমিকায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ অভিনেতা গুরুদাসকেও আকৃতি প্রকৃতি, রামকৃষ্ণের অনুকরণে কথা বলার ঢং-এ অভ্রান্তভাবে 'বায়োপিক' ফুটে উঠেছে। কিশোরী রাসমণির ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তৎকালীন (গত শতকের পাঁচের দশকের মাঝামাঝি) বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী শিখা বাগ। দর্শকমনে 'রানি রাসমণি' এক অক্ষয় ভাবমূর্তি রেখে গেছেন। সর্বাপেক্ষা মহিমান্বিত দৃশ্য হলো, স্বামী রাজচন্দ্রের স্মরণে রাসমণির 'বাবুঘাট' নির্মাণ। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন সেই উপলক্ষ্যে। বাবুঘাট নির্মাণের দিন রাসমণি নির্জলা উপবাসী ছিলেন। জীবনীচিত্র হিসাবে 'রানি রাসমণি' ও তাঁর নামভূমিকাভিনেত্রী মলিনাদেবী চিরন্তনী ও চিরস্মরণীয়া হয়ে আছেন। ■

কমিউনিস্ট নির্মিত কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদের পরিসমাপ্তি

অভিমন্যু গুহ

৩৭০ ধারা বাতিল তো হালের ঘটনা। অতি বাম টুকরে গ্যাং আর বিচ্ছিন্নতাকামী মুসলমান মৌলবাদী গোষ্ঠী, দু'তরফের মুখেই করাই এদের মূল লক্ষ্য এবং 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদে'র ধুয়ো ওঠে সেইজন্যই। কিন্তু সত্যিই কি 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদ' বলে কোনও বস্তু আদৌ ছিল? এমনকী সুদূর

'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদে'র ধ্বনি শোনা যেত। এদের বৌদ্ধিক মুখপত্র, বাঙ্গলার একটি দৈনিকেও এক মাননীয়র লেখা একাধিক উত্তর সম্পাদকীয় সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত হয়েছে যেখানে 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদে'র কথা তুলে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলিক সত্তা থাকতেই পারে কিন্তু যে অখণ্ড রাষ্ট্রচেতনা যাকে আরও বৃহত্তর অর্থে 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' বলা চলে, যা ভারতবর্ষকে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে তা অস্বীকার করা হচ্ছে কায়েমি স্বার্থের জন্য, স্রেফ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তা এতদিনে স্পষ্ট। মজার ব্যাপার হলো 'জাতীয়তা'র চেয়ে আন্তর্জাতিকতাকে এরা অনেক বড়ো মনে করে, আবার আন্তর্জাতিকতার চেয়েও এদের কাছে বেশি গুরুত্ব পায় 'আঞ্চলিকতা', যাকে 'আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ' বলে চিহ্নিত করে প্রদেশিকতার দোষ এড়ানোরও চেষ্টা হয়।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের অখণ্ডতা বিঘ্নিত করা এই ধরনের বিচ্ছিন্নতবাদী গোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য। ভারতের থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন অতীতেও। ইতিহাস বলছে বহিরাগত মুঘলরা এখানে ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৩ পর্যন্ত রাজত্ব করার পর আফগানেরা ১৭৫৩ থেকে ১৮১৯ পর্যন্ত কাশ্মীর শাসন করেন। এরপর শিখেরা ১৮১৯ থেকে ১৮৪৬ পর্যন্ত এবং তারপরে ডোগরা-রা ১৮৪৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। মহারাজা হরি সিংহ ছিলেন শেষ ডোগরা রাজ। ব্রিটিশ আমলে দেশীয় রাজার শাসনাধীন রাজ্য অর্থাৎ প্রিন্সলি স্টেটের মর্যাদা পায় কাশ্মীর। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার সময়ও স্বাধীন রাজ্য হিসেবে কাশ্মীরকে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান কাশ্মীরকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়। হরি সিংহ নেহরু'র সাহায্যপ্রার্থী হন, ভারতভুক্তি চান, তারপর নেহরু'র অকর্মণ্যতায় কীভাবে কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি হয় সেই ইতিহাস কম-বেশি সকলেরই জানা।

চারশো সাড়ে চারশো বছরের ইতিহাস এভাবে কয়েক লাইনে সেরে দেওয়া যায় না, মূল ইতিহাসটি একনজরে দেখানো হলো যেখানে 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদ' বলে বিষয়টি আসার কোনও সম্ভাবনা নেই। কমিউনিস্টরা একটা গল্প সচেতনভাবে রটায় যে কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহ ছিলেন হিন্দু আর প্রজারা মুসলমান। তাই রাজায়-প্রজায় মেলেনি, মুসলমান প্রজারা পাকপন্থী হওয়ায় হরি সিংহের উচিত ছিল পাকিস্তানের কাছে নতি স্বীকার করা ইত্যাদি। বামপন্থীদের এই থিয়োরি আজও চলেছে, মাঝখান থেকে সুযোগ বুঝে 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদে'র টুইস্ট ঢুকে গেছে এই যা। কমিউনিস্টরা থাকবে আর রাজায়-প্রজায় মেলবন্ধন হবে এমন আশা অতিবড় মুর্খেও করবে না। বরং রাজার অত্যাচার, শোষণ, আরেকটু এগিয়ে শ্রেণি সংগ্রাম, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এমনতরো নানা থিয়োরি থাকবে, ভারতবর্ষ হলে যার মূল শর্ত থাকবে প্রবল দেশবিরোধিতা।

এবার মূল কথায় ফেরা যাক। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ায় কাশ্মীরে গঠিত হয় 'রিডিং রুম পার্টি' বলে একটি রাজনৈতিক দল। যদিও ভোটে লড়ার অধিকার তারা লাভ করতে পারেনি। এই 'রিডিং রুম পার্টি' আসলে ছিল একটি কমিউনিস্ট গোষ্ঠী, যাদের লক্ষ্য ছিল ডোগরাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলা। জেহাদি- কমিউনিস্ট যোগসাজশে মুসলিম লিগ তখন ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার সহধর্মী সংগঠন হয়ে উঠেছে। কাশ্মীরে সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টি করায় অসুবিধে ছিল, প্রশাসনিক কারণেই। তাই বাম তাত্ত্বিকরা 'রিডিং রুম পার্টি'র তলায় একত্রিত হয়েছিল। মুসলিম লিগের সহযোগী হিসেবে মুসলমানদের মাথা খেতে তাদের সুবিধাই হয়েছিল। তার ওপরে মুসলমানেরা প্রজা হওয়ায় আরও সোনায় সোহাগা হয়। কাশ্মীরের ডোগরা সম্প্রদায় বনাম মুসলমান লড়াইয়ের পটভূমি এভাবেই ১৯৩০-এর দশকে সুকৌশলে তৈরি করে ফেলেছিল কমিউনিস্টরা, '৪৭ পরবর্তী সময়ে যা বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে যায়।

শুধুমাত্র মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলার মতো 'গ্রাউন্ড লেভেলে'র কাজই নয়,

কাশ্মীরের বৌদ্ধিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও রিডিং রুম পার্টির মাধ্যমে জাঁকিয়ে বসে কমিউনিস্টরা। শ্রীনগরের এক তাত্ত্বিক জাহিদ গুলাম মহম্মদের ভাষায়— '১৯৩০-এর দশক থেকে শুরু করে দু'দশক ধরে জম্মু-কাশ্মীরের বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের দখল কমিউনিস্টদের হাতেই থাকে। ১৯৩৮-এর পর কিছু কাশ্মীরি নেতৃত্ব কাশ্মীরকে সমাজবাদী আদর্শের গবেষণাগার-এ পরিণত করে। ১৯৩৯-এর জুনে রিডিং রুম পার্টি নিতান্ত এক মুসলমান সমাবেশকে 'জাতীয় সমাবেশ' হিসাবে ঘোষণা করে। কাশ্মীরি পণ্ডিত-লেখক প্রেমনাথ বাজাজের কথায় শেখ মহম্মদ আবদুল্লা এরপরেই 'কাশ্মীরি মুসলমানদের ক্ষমতায়নের খোয়াব দেখতে থাকেন।' বিষয়টি এতেই থমকে গেল না, রিডিং রুম পার্টির দলীয় পতাকা তৈরি হলো। ঘোরতর রক্তিম বর্ণের মাঝে সাদা রঙের লাঙল— চিরাচরিত কমিউনিস্ট ঢঙে, রুশ বিপ্লবের থেকে প্রেরণা নিয়ে। নন্দিতা হাকসারের 'মেনি ফেসেস অব কাশ্মীরি ন্যাশনালিজম' গ্রন্থে দেখানো হয়েছে এভাবেই যুব কাশ্মীরিদের মনের মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার বিপ্লবের আদর্শ গেঁথে দেওয়ার কজটা খুব ধীরে সুস্থে সম্পন্ন করা হয়ে গেল। অন্যদিকে কৃষকের লাঙল চিহ্নটি বহু দরিদ্র মুসলমানের মনে কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তুলল। মানুষের দারিদ্র্য নিয়ে রাজনীতি এদের চাইতে ভালো আর কেই বা করতে পারে।

কাশ্মীরে কমিউনিস্ট রিডিং রুম পার্টির প্রতিষ্ঠাতারা বলাই বহুল্য প্রত্যেকেই ছিলেন 'ধর্মপ্রাণ' মুসলমান। যাদের নাম বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে তাদের মধ্যে গুলাম আহমেদ আসাই, খাওয়াজা গুলাম নবি গিলকার, মৌলভি বাসির আহমেদ, মহম্মদ রাজার প্রমুখ। প্রকৃত কমিউনিস্ট চরিত্রের মতো এরা কেউই গরিব, খেটেখাওয়া বা কৃষক সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন না কিন্তু দারিদ্র্য ও অভাবের সুযোগ নেওয়ার মতো বামপন্থী মেধা তাদের যথেষ্টই ছিল। এমনকী এদের পরবর্তী প্রজন্মও যথেষ্ট ধনী, প্রতিষ্ঠিত, যাদের পিতৃপুরুষ করে-কম্মে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছেন।

রাজার বিরুদ্ধে প্রজার ক্ষোভ থেকে

(বাঁ দিক থেকে) চৌধুরী গুলাম আব্বাস (প্রতিনিধি), শেখ মহম্মদ আবদুল্লা, মিস্ত্রি ইয়াকুব আলি, সরদার গওহর রেহমান। গুলাম নবি গিলকর, মৌলবি আবদুল রহিম (দাঁড়িয়ে)

থাকেই, ক্ষেত্র বিশেষে তা অসমীচীনও নয়, কিন্তু কমিউনিস্ট কূট-কৌশলে কাশ্মীরে হিন্দু ডোগরা সম্প্রদায় বনাম মুসলমান সম্প্রদয়ের যে সংঘাতের পটভূমি স্বাধীনতার বহু আগেই তৈরি হয়ে গেছিল, যার বিষ-পরিণাম শুধু '৪৭-এ স্বাধীনতার সময়ই নয় আজও ভুগতে হচ্ছে। এই হচ্ছে বামপন্থী নির্মিত 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদ'-এর মূলসূত্র, এই তত্ত্বের প্রতি আজও কাদের দরদ দেখুন তাহলেই সবটা বুঝতে পারবেন। কস্মিনকালেও 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদ' বলে কিছু ছিল না। কমিউনিস্টদের অন্ধ ভারতবিদ্বেষ অস্বাভাবিক একটি তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিল আজ তা পরিসমাপ্তির মুখে।

কাশ্মীরকে বাকি ভারতবর্ষের সঙ্গে মেলাতে গেলে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তির প্রয়োজনীয়তা এখন সকলেই বুঝতে পারছেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সমেত তাদের মতাদর্শধারীরা যে 'কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদে'র ধুয়ো তুলে কিংবা 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার'-এর থিয়োরি আউরে এসেছিল এতদিন তারাই যদি বলে ৩৭০ ধারা বাতিল মানে কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ, তখন চক্রীদের চেনাটা খুব সহজ হয়ে যায়। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও তাই বলা চলে এটি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, অদূর ভবিষ্যতে এই কাশ্মীরও ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসবে এটা তাই আশা করাই যায়। কাশ্মীর সমস্যার মূলে নেহরু আছেন ঠিকই, কিন্তু নেহরুর গুণগ্রাহী কমিউনিস্টদের দেশদ্রোহী পন্থাও এর জন্য কম দায়ী নয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

- যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯-এর আগে শেষ হচ্ছে তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে পরবর্তী নবীকরণের টাকা ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বস্তিকা কার্যালয়ে জমা করুন। যাতে আপনার পূজা সংখ্যাটি পাঠানো সম্ভব হয়।
- স্বস্তিকার এজেন্টদের বিশেষ অনুরোধ করা হচ্ছে যে, আগস্ট '১৯ মাসের বিল সমেত সমস্ত বকেয়া টাকা ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বস্তিকা কার্যালয়ে পাঠান, যাতে আপনার প্রয়োজনীয় পূজা সংখ্যা সময়মতো পাঠানো যায়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ৫।।

স্মরণে

তাঁর চরিত্রের বর্ণময়তা বিরুদ্ধবাদীরাও তল করতে পারতেন না

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ জেটলির অকাল প্রয়াণের পর দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মী অমিত শাহ তাঁর ও দলের অপূরণীয় ক্ষতির কথা স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার দিনে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছিছেন, উত্তরপ্রদেশে বিপুল জয়ের খবর যখন টিভিতে আছড়ে পড়ছে, এই জয়ের প্রত্যক্ষ কাণ্ডারি হওয়া সত্ত্বে অমিত উচ্ছ্বাস প্রকাশে ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। অমৃতসরে অরুণ জেটলি অমরিন্দর সিংহের কাছে পিছেয়ে পড়ায় তিনি ছিলেন বিমর্ষ। জেটলির পরাজয়ের পর তিনি প্রকাশ্যে ভেঙে পড়েন। বিজেপির এক সময়ের এই অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মকর্তা থেকে অর্থমন্ত্রী হওয়া মানুষটির ওপর তাঁর নির্ভরশীলতা ছিল অগাধ। ২০১৪ সালে বিজেপি সভাপতি হওয়ার পরে পরেই মহারাষ্ট্র নির্বাচন সামনে এসে পড়ে। নির্বাচনে দল একা লড়বে না শিবসেনার সঙ্গে জোট করবে এ নিয়ে প্রবল দোটানায় ছিলেন তিনি। জেটলি তখন bariatric অস্ত্রপ্রচারজনিত কিছু জটিলতা নিয়ে দিল্লির হাসপাতালে। সব ভুলে শা ছোটেন জেটলির কাছে। জেটলিও ডাক্তারদের আদেশ অমান্য করে রোগশয্যায় সভাপতিকে মূল্যবান পরামর্শ দেন। নিজের শরীরকে তুচ্ছ করে দলের প্রতি এই দায়বদ্ধতা অমিত চিরকাল মনে রেখে দেন। বয়সে অনেক ছোটো হলেও সংসদে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির বিল (এর রচনায় জেটলির বড়ো ভূমিকা ছিল) পাশ হওয়ার পর তিনি জেটলির আশীর্বাদ চেয়েছিলেন। এতটাই ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক।

একই কথা খাটে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ক্ষেত্রেও। অমৃতসরে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তিনি টের পান জেটলির পক্ষে আবহাওয়া ভালো নয়। তিনি তখনই প্রিয় সুহৃদকে না চাইতেই কথা দেন দিল্লিতে তাঁর জন্য উপযুক্ত পদ অপেক্ষা করছে। কথা রেখেছিলেন। শা এরই মতো ২০১৯-এ জিতে আসার পর শারীরিক অক্ষমতার কারণে জেটলি যখন সরে

যেতে চাইলেন মোদী মানতে চাননি। তিনি জেটলিকে রাজি করাতে তাঁর বাড়ি ছুটে যান। তিনি ব্যর্থ হন সকলেই জানেন।

এই যে নির্ভরতা, অটল বিশ্বাস এগুলি কোনো ব্যক্তির একদিনের অর্জন নয়। ২০১৪-য় দিল্লিতে ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত রাজধানীর তথাকথিত পণ্ডিত ইংরেজি মিডিয়া যারা বিজেপি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করেই জীবন জীবিকা নির্বাহ করত তাদের সঙ্গে পাঙ্গা নিতেন জেটলি। এই কংগ্রেস ও বামপন্থী ধামাধরা মিডিয়া আবার চোস্ত ইংরেজি না বলতে পারলে তাকে ধর্তব্যের মধ্যেই নিত না। এখানেও তাদের একা হাতে হারিয়ে দেন জেটলি। দিল্লির বিখ্যাত শ্রীরাম কলেজ ও পরে দিল্লি ইউনিভার্সিটির তুখোড় ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি ইংরেজি তো বটেই হিন্দিতেও ছিলেন সমান দক্ষ।

তাঁর চরিত্রের যে বর্ণময়তা সেটাই বিরুদ্ধবাদীরা ঠিক তল করতে পারতেন না। অনেক সময়ই অত্যাধুনিক পোশাক পরা, অভিজাত রেঁস্তোরায় খাওয়া দাওয়া (আদবানী এ বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন) প্রাতর্ভ্রমণে দলের মতাবলম্বী নয় এখন বহু লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব অথচ ঠিক সময়ে রামমন্দির নিয়ে কোমর বেঁধে লড়ে যাওয়া এই প্রখর জাতীয়তাবাদীর চরিত্রের আন্দাজ পাওয়া তাদের পক্ষে বাস্তবিকই কঠিন হয়ে পড়ত। প্রাতর্ভ্রমণে তিনি যেখানে নিত্য চা-চক্রে মিলিত হতেন সেই জায়গাটির নামই হয়েছিল জেটলি কর্নার।

এই সর্বস্তরের পরিচিতি ও সফল আইনজ্ঞ হওয়ার সুবাদে বিপক্ষের মতকে অকাট্য যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার স্বাভাবিক প্রতিভার সঙ্গে আলাপী ব্যক্তিত্বের সংমিশ্রণ বিরোধীদের কাছে দলমত নির্বিশেষে তাঁকে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল। ২০১৪-য় নীতীশকুমার ঘোর মোদী বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও জেটলি সঙ্গ কখনও ত্যাগ করেননি। তাঁর ফিরে আসার পথ তাই অত সহজে সুগম হয়েছিল। তিনি জানতেন তাঁর সুহৃদ একজন আছে।

তীক্ষ্ণ যুক্তিজালে সংসদ বা টুইটারের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে তীব্র আক্রমণ করলেও ব্যক্তিগত সখ্য তিনি কখনও অস্বীকার করতেন না। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অর্থমন্ত্রী হিসেবে এক দেশ এক কর ব্যবস্থার যে জিএসটি বিল ও ব্যাঙ্কগুলির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে IBC (insolvency bankruptcy code) চালু করে গেলেন ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

ব্যক্তিজীবনে দুর্নীতিকে বরাবর ঘৃণা করে এসেছেন জেটলি। Rafale-এর বানানো কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সংসদে যে ভাবে কংগ্রেস সভাপতিকে সাধারণ পাটিগণিতের জ্ঞানহীন বলে প্রতিপন্ন করেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও সততা এতটাই সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিল যে বিপক্ষ দলের তাবড় নেতা প্রয়াত মাধবরাও সিন্ধিয়া থেকে শরদ যাদব নিজেদের ব্যক্তিগত মামলা নির্ভয়ে তাঁর হাতে তুলে দিতেন। আদালতে গোধরা ও সোরহাবউদ্দিন মামলা নিয়ে তাঁর সফল লড়াই তো সকলেই জানেন।

জর্জ ফার্নান্ডেজ যেমন প্রথম এনডিএ সরকারে সফল দৌত্যকার ছিলেন মোদী সরকারের এই সর্বজনগ্রাহ্য ও শ্রদ্ধেয় দৌত্যকারের গায়ে কালি ছিটোতে এসেছিলেন বালখিল্য কেজরিওয়াল। কোর্টে, টাকা জমা দিয়ে মানহানির মামল করার পর এই মিথ্যাবলম্বী নেতা মুচলেকা দিয়ে ক্ষমা চান। অপূরণীয় কথাটা আকছার চলে। জেটলির বিদায় কেবল বিজেপির জন্য নয় দেশের পক্ষেও অপূরণীয় ক্ষতি। ▌

ভারতের স্বাধীনতা ও আজাদ হিন্দ বাহিনী

প্রণব দত্ত মজুমদার

ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস রচনায় এমন একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেন গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, আইন অমান্য ইত্যাদি আন্দোলনের ফলে এবং পরিশেষে ৪২ এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের জেরেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। সত্যই কি তাই? ইংরেজের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর আন্দোলনগুলো পর্যালোচনা করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে গান্ধীজী কোনো আন্দোলনকেই ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেননি, সব আন্দোলনই দানাবাঁধার মুহূর্তে অবাস্তব কারণ দেখিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

যেমন ১৯১৯ সালে কুখ্যাত রাউলাট অ্যাক্ট ও তজ্জনিত কারণে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন গান্ধীজী সেই আন্দোলন যখন জোরদার হয়ে উঠেছিলো তখন চৌরিচৌরাতে সত্যাগ্রহীরা হিংসার আশ্রয় নিয়েছে এই কারণ দেখিয়ে ১৯২২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহ আশ্রমের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। আবার 'সাইমন কমিশনের' প্রেক্ষিতে ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ গুজরাটের সবরমতীর সত্যাগ্রহ আশ্রম থেকে 'ডান্ডি মার্চ'-এর মাধ্যমে আরম্ভ করেছিলেন অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন। আন্দোলন যখন তীব্র আকার নিয়েছিল তখন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে লন্ডনের গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনার ডাক পেতেই ইংরেজের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে এই বলে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং আলোচনার জন্য বিলেতে যান, কিন্তু ফিরে এসেছিলেন খালি হাতে। আসলে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির চাইতেও অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে নিজেকে একজন অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যই যেন আসল ছিল গান্ধীজীর কাছে। তিনি নিজেই বলতেন অহিংস পথে স্বাধীনতা যদি হাজার বছর পরেও আসে তবে সেটাই কাম্য।

কংগ্রেসের তরুণ নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু গান্ধীজীর এই ধরনের আন্দোলন দেখে বলেছিলেন গান্ধীজীর পথে সাম্রাজ্যবাদী চতুর ইংরেজের কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতা পাওয়া সম্ভব নয়; ইংরেজের সঙ্গে সংঘর্ষের পথে যেতে হবে এবং কংগ্রেসকে সেই জন্য নতুন নেতা চয়ন করতে হবে। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হন এবং কংগ্রেসকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘর্ষ করার পথে তৈরি করার কাজে লেগে যান। ইংরেজের বিরুদ্ধে সুভাষের এই আগ্রাসী আন্দোলনের পথ পছন্দ হয়নি অহিংস গান্ধীজীর। তাই পরের বছর সুভাষ আবার কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হলে গান্ধীজী ষড়যন্ত্র করে সুভাষকে কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন। সুভাষ নতুন পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরি করে তাঁর মত ও পথের প্রচার জারি রেখেছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর শেষ আন্দোলন ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট থেকে ভারত ছাড় আন্দোলন। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে নির্মম ভাবে এই আন্দোলনকে দমন করেছিল ইংরেজ সরকার। ৯ আগস্টই গান্ধীজী-সহ কংগ্রেস নেতাদের জেলবন্দি করা হয়েছিল। সমস্ত নেতারাই যখন জেলে বন্দি তখন নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলন দিশাহীন হয়ে পরে এবং ইংরেজ সরকার নির্মমভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়।

১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কংগ্রেসের আন্দোলনের আর কোনো নামগন্ধই ছিল না। ১৯৪৪ পর্যন্ত নেতারা সবাই তো জেলে ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজপক্ষ জয়ী হলো। জয়ী হওয়া সত্ত্বেও বিজয়ী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী ইংরেজ কেন তড়িঘড়ি ভারত ছেড়ে চলে গেল? সে কি অহিংস সত্যাগ্রহী গান্ধীর ভয়ে? তখন তো কংগ্রেসের বেশিরভাগ নেতাই বয়সজনিত কারণে হতোদ্যম ও হতাশ হয়ে গেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে নতুন করে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করার আর কোনো ক্ষমতাই ছিল না তাঁদের। তা হলে ইংরেজ চলে গেল কেন? আসল ইতিহাসটা কী ছিল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় সুভাষচন্দ্রকে ইংরেজ সরকার তাঁদের এল্‌গিন রোডের বাড়িতে নজরবন্দি করে রেখেছিল। সুভাষচন্দ্র অসামান্য চতুরতায় ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তিনি ছদ্মবেশে অবিশ্বাস্য চাতুর্যে আফগানিস্তান, রাশিয়া হয়ে জার্মানিতে চলে যান। তারপর সেখান থেকে জার্মান সাবমেরিনে ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল অভিযানে জাপানে আসেন। সেখান থেকে ১৯৪৩ সালের জুলাইয়ের প্রথম

দিকে সিঙ্গাপুরে গিয়ে রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে সবাই তাঁকে নেতাজী বলে সম্বোধন করতে থাকেন। তিনি জাপানি সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ইংরেজ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পরেছিলেন এবং ইংরেজের দখলে থাকা ভারতের বহু অঞ্চল দখল করে নিয়েছিলেন। তিনি ডাক দিয়েছিলেন দিল্লি চলো। ১৯৪৩ সালে ২১ অক্টোবর তিনি তৈরি করেন স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার। পৃথিবীর ১১টি দেশ সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই অর্থে নেতাজী সুভাষকেই অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মান্যতা দেওয়া উচিত। ১৯৪৪ সাল থেকে জাপান পরাজিত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট মিত্রবাহিনীর শরিক আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে অ্যাটম বোমা ফেলে। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে। আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ব্রিটিশরা বন্দি করে। ১৮ই আগস্ট সুভাষচন্দ্র আবার অন্তর্ধান করেন। এর পরে তাঁর আর কোনো সঠিক খবর পাওয়া যায় না।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের দিল্লির লালকেল্লায় এনে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বিচার আরম্ভ হয়। যুদ্ধ চলার সময় নেতাজী ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মবলিদানের কাহিনি সেভাবে দেশের আপামর জনসাধারণের গোচরে আসেনি। কিন্তু লালকেল্লায় যখন তাঁদের বিচার করে শাস্তি দানের ব্যবস্থা হয় তখন তা দাবানলের মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পরে। নেতাজী সুভাষ ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুঃসাহসিক যুদ্ধ এবং আত্মবলিদানের কথা জানতে পেরে সারা দেশ উদ্বেল হয়ে উঠে, চারদিকে তীব্র বিক্ষোভ আরম্ভ হয়ে যায়। ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় সেনারা যখন জানতে পারল তাঁদেরই সহকর্মী সৈনিক যারা একসময় ব্রিটিশের গোলাম হয়ে অস্ত্র ধারণ করেছিল, তাঁরা জাপানের হাতে বন্দি হওয়ার পরে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগদান করে মাতৃভূমির স্বাধীনতার লড়াইয়ে অক্লেশে অকাতরে জীবন বলিদান করেছেন; আবার তাঁদের মধ্যেই যারা বেঁচে আছে তাঁদের বিচার করে ইংরেজ সরকার শাস্তি দানের ব্যবস্থা করছে তখন দেশপ্রেমের এক তীব্র আগুন তাদের মধ্যে জ্বলে উঠল। তাঁরা দিকে দিকে বিদ্রোহ আরম্ভ করে দিল। প্রথমে নৌ বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দিল, তারপর তা স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাক্তন ভারতীয় সৈনিকরাও দেশপ্রেমে উদ্বেল হয়ে অস্ত্র হাতে রাস্তায় বেরিয়ে এল। রাস্তাঘাটে তাঁরা ইংরেজদের ধাওয়া করতে আরম্ভ করল। নেতাজী আজাদ হিন্দ বাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেমের যে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলেন তা ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়ে গেল। যেন এক বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ক্লান্ত ব্রিটিশ সেনানীরা দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব, নতুন করে বড় কোনো সংঘাতে যেতে তারা অপরাগ। ইংরেজ নারী ও শিশুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো। তাদের দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকারের উপর চাপ তৈরি হোলো। এদিকে বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইংলন্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ, অর্থনৈতিক ভাবে তারা দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ের ব্রিটেনের অবস্থা লিপিবদ্ধ করেছেন Alex von Tunzelmann তাঁর Indian Summer গ্রন্থে। এক কথায় ভয়াবহ অবস্থা তখন ব্রিটেনের। সুতরাং অন্য জায়গা থেকে গোরা সৈনিক এনে এতবড় ভারতবর্ষকে নিজেদের কবজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল তাদের পক্ষে। মেজর জেনারেল জি ডি বক্সীর সেই বই থেকে জান যায়—''Achinlek now warned his Army commanders that they could no longer rely on the soldiers of the Indian Army. He warned the Government in London to hastily announce the British departure. Both the soldiers, Wavell and Auchinlek were now crystal clear it was all over for the Raj.'' (P-292) Auchinlek তখন ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ, R. Wavell ছিলেন গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়। তাঁরা উপলব্ধি করলেন ভারতকে পরাধীন করে রাখা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব নয়— এবার ভারত ছেড়ে যেতে হবে। বড়লাট Wavell লিখেছেন—''This is the first occasion when an anti-British politician has acquired a hold over substantial number of men in the Indian Army and the consequences are incalculable.''

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে দমন করতে পারলেও নেতাজী সুভাষের আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারের অভিঘাতে ব্রিটিশ বাহিনীর ভারতীয় সৈনিকদের ভিতরে দেশপ্রেমের যে আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিলো এবং তার ফলে যে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছিলো তা দমন করার মতো পরিস্থিতি তখন ইংরেজ সরকারের ছিল না। তাই তারা বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলেও ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিল। মেজর জেনারেল জি ডি বক্সী তাঁর সেই বইতে লিখেছেন—''Had the Indian armed forces remained loyal or there had been enough British divisions to keep them in check, the British would never have left India.'' (P-295).

অবশেষে দেশ বিভাজনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এটাই ছিল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কারণ। গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলন বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ভয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায়নি। এই ইতিহাসকে এতদিন ধরে সুচতুরভাবে আড়াল করে রাখা হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেন্ট অ্যাট্‌লি। তিনি ১৯৫৬ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন জাস্টিস পি বি চক্রবর্তী। তিনি নানারকম আলোচনার মাঝে অ্যাট্‌লিকে জিজ্ঞেস করেন—''১৯৪৭ সালের অনেক আগেই প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলন মৃত হয়ে গিয়েছিল এবং তখন ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের পরিস্থিতি ছিল না। তাহলে ব্রিটিশ কেন দ্রুততার সঙ্গে ভারত ছেড়ে চলে গেল?" অ্যাট্‌লি এই কারণ সেই কারণের সঙ্গে মুখ্য যে কারণটি বলেছিলেন তা হলো সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কার্যকলাপ। আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রভাব ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রভাবে যে সেনা বিদ্রোহ হয়েছিল তাতে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন ভারত ব্রিটিশদের পক্ষে আর নিরাপদ জায়গা নয়। জাস্টিস চক্রবর্তীর পরের প্রশ্ন ছিল—''কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্রিটিশের ভারত তাগের সিদ্ধান্তকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?" অ্যাট্‌লি অবজ্ঞাসুলভ বক্রোক্তি করে বলেছিলেন— M-I-N-I-M-A-L, অর্থাৎ খুবই সামান্য। ■

পরোপকারিতা সংক্রান্ত প্রথম বিশ্ব যুব সম্মেলন উদ্বোধন রাষ্ট্রপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ নতুন দিল্লিতে পরোপকারিতা সংক্রান্ত প্রথম বিশ্ব যুব সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে এক সমাবেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, মহাত্মা গান্ধী কেবল একজন মহান নেতা ও দূরদর্শী ব্যক্তিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি নিজেকে চিরন্তন মূল্যবোধ ও আদর্শের মূর্ত প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমাদের বর্তমান সময়ে শান্তি ও সহনশীলতা তথা সন্ত্রাসবাদ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার ক্ষেত্রেও গান্ধীজী সমান প্রাসঙ্গিক।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বর্তমান সময়ে বিশ্ব জুড়ে আমরা যে হিংসা ও শত্রুতার ঘটনা দেখতে পাচ্ছি, তার শেকড় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার গভীরে প্রোথিত। এ ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতাই 'আমাদের বিরুদ্ধে তারা' মনোবৃত্তির ধারণা গড়ে দিচ্ছে।

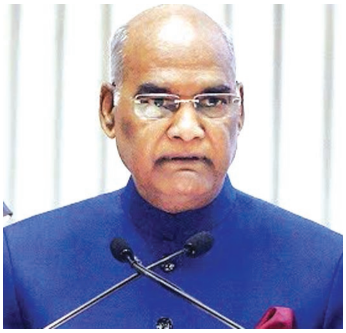

গান্ধীজীর দেখানো পথ অনুসরণ করলেই আমরা আমাদের ছেলে-মেয়েদের শেখাতে পারব, আমরা যাদের 'তারা' বলে গণ্য করে থাকি, আসলে তারা সকলে আমাদেরই অঙ্গ। শ্রী কোবিন্দ বলেন, সহানুভূতিশীল বোঝাপড়া গড়ে তোলার সেরা উপায় হলো পারস্পরিক মতবিনিময় ও কথোপকথন। এভাবেই আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব ত্যাগে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ও কাঠামোতে পরিবর্তনের প্রয়োজন। শিক্ষাকে সাক্ষরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখলে চলবে না, শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যা যুবাদের গভীর আত্মঅনুসন্ধান ও আন্তরিক বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে।

সম্মেলনে সারা বিশ্ব থেকে আসা যুবাদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের বিশ্বকে সমবেদনাময় ও শান্তিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে তাঁদের মতো লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এই সম্মেলন থেকে যুবারা যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন তা তাঁদের বাকি জীবনে পরোপকারিতার দূত হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করবে। সম্মেলনে ২৭টি দেশে যুবক-যুবতীরা অংশ নিয়েছেন। শান্তি ও সুস্থায়ী উন্নয়নের জন্য ইউনেস্কোর মহাত্মা গান্ধী ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক যৌথভাবে সম্মেলনের আয়োজন করেছে।

জেনেরিক ওষুধ এবং ওষুধের দোকান অনুসন্ধানের জন্য 'জনৌষধি সুগম' মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রী ডি ভি সদানন্দ গৌড়া দিল্লিতে 'জনৌষধি সুগম' মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের সূচনা করেছেন। এক বছর আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনৌষধি সুবিধা জীবানুমুক্ত স্যানিটারি ন্যাপকিন পাওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণা মতো এখন থেকে মাত্র এক টাকায় এই 'জনৌষধি সুবিধা জীবাণুমুক্ত স্যানিটারি ন্যাপকিন' পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, 'জনৌষধি সুগম' মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে খুব সহজেই সাধারণ মানুষ জনৌষধি জেনেরিক ওষুধ এবং ওষুধের দোকান অনুসন্ধান করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী মনসুখ এল মান্ডোভিয়া। তিনি বলেন, দেশে প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ মহিলা শিক্ষার অভাবে এবং দামের কারণে ভালো মানের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহার করতে পারেন না। কেন্দ্রীয় ফার্মাসিউটিক্যাল দপ্তর প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে সুলভে ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান শ্রী মান্ডোভিয়া। তিনি বলেন, ২০১৮ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কেন্দ্রীয় সরকার দু-টাকা পঞ্চাশ পয়সা মূল্যে 'জনৌষধি সুবিধা জীবাণুমুক্ত স্যানিটারি ন্যাপকিন' দেশের প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন। এ বছরের ৩১ জুলাই পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি কেন্দ্র থেকে ১ কোটি ৩০ লক্ষ এই ধরণের স্যানিটারি ন্যাপকিন প্যাড বিক্রি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি মতো ভারতীয় মহিলাদের কাছে স্যানিটারি ন্যাপকিনকে আরও সহজলভ্য করে তুলতে কেন্দ্রীয় সরকার এখন থেকে প্রতি প্যাড এক টাকা দরে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জনৌষধি সুগম মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে বেশকিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। খুব সহজে এই অ্যাপ্লিকেশন থেকে জনৌষধি কেন্দ্রের ঠিকানা পাওয়া যাবে। গুগল ম্যাপের সাহায্যে জনৌষধি কেন্দ্র খুঁজে পেতেও সুবিধা হবে। এমনকী জনৌষধি জেনেরিক ওষুধ, তার উপকরণ এবং কত টাকা সাশ্রয় হচ্ছে তাও জানতে পারবেন ক্রেতারা। গুগুল প্লে-স্টোর এবং অ্যাপল প্লে-স্টোর থেকে বিনামূল্যে এই অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করা যাবে।

সংবাদ প্রতিবেদন

দশম নগরকেন্দ্রিক গ্যাস বণ্টন প্রক্রিয়ার সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে ১২৪টি জেলায় ৫০টি ভৌগোলিক অঞ্চলে নগরকেন্দ্রিক গ্যাস বণ্টন কর্মসূচির সূচনা করেন। দশম পর্যায়ে নগরকেন্দ্রিক গ্যাস বণ্টন প্রক্রিয়ার দরপত্র আহ্বানের পর ১২টি দরপত্র আহ্বানকারী সফল হয়েছিলেন। সফল এই দরপত্র আহ্বানকারীদের শ্রী প্রধান গত পয়লা মার্চ কাজকর্ম রূপায়ণের সম্মতিপত্র প্রদান করেন। নগরকেন্দ্রিক গ্যাস বণ্টন প্রক্রিয়ার দশম পর্যায়ের কাজ শেষ হলে দেশের ৭০ শাতংশ জনগণ এবং মোট ভৌগোলিক এলাকার ৫২.৩ শতাংশ গ্যাস বণ্টন ব্যবস্থার আওতায় এসে যাবে। দশম পর্যায়ের গ্যাস বন্টন প্রক্রিয়ায় ২ কোটি ২ লক্ষ পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে। এই জন্য ৩ হাজার ৫৭৮টি সিএনজি স্টেশন চালু করা হবে এবং গ্যাস বণ্টনের জন্য ৫৮ লক্ষ ইঞ্জি-কিলোমিটার দীর্ঘ ইস্পাতের পাইপলাইন বসানো হবে।

এই উপলক্ষ্যে শ্রী প্রধান বলেন, নবম ও দশম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশে নগরকেন্দ্রিক গ্যাস বণ্টন ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি ঘটবে। তিনি আরও জানান, বিগত ৫ বছরে দেশে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সংযোগ, সিএনজি চালিত যানবাহন এবং সিএনজি স্টেশনের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শক্তি ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে উল্লেখ করে শ্রী প্রধান বলেন, আগামী এক দশকে দেশ শক্তি ক্ষেত্রে বিশ্বের অগ্রণী গ্রাহক হয়ে উঠবে। সরকারের উদ্দেশ্য হলো সকলের কাছে সুলভে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্বাসযোগ্য পরিশ্রুত জ্বালানী পৌঁছে দেওয়া। শ্রী প্রধান আরও জানান, দেশে শক্তি ব্যবহারের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে, সিএনজির ব্যবহারও ধীরে

ধর্মেন্দ্র প্রধান

ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে ইতিমধ্যেই হাইড্রোজেন জ্বালানী চালিত যানবাহনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। একাধিক মোটরগাড়ি উৎপাদক সংস্থা ও নতুন সিএনজি মডেল বাজারে এনেছে।

শ্রী প্রধান জানান, গ্যাস পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে। গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে নতুন গ্যাস ভাণ্ডারের অনুসন্ধান, গ্যাস বণ্টন, বিতরণ, পাইপলাইন স্থাপন প্রভৃতির ওপর। এক পরিসংখ্যান দিয়ে তিনি বলেন, ২০১৮-১৯এ দেশে গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩২.৮৭ বিলিয়ন কিউবিক মিটার। ২০২০-২১ নাগাদ উৎপাদন পরিমাণ ৩৯.৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটারে পৌঁছাবে। দেশে তরল প্রাকৃতিক গ্যাস শোধনাগারগুলির ক্ষমতা বর্তমানে বার্ষিক ৩৮.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে আগামী তিন-চার বছরে বাড়িয়ে বার্ষিক ৫২.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। একইভাবে গ্যাস গ্রিডে বর্তমান দৈর্ঘ্য ১৬ হাজার ৭৮৮ কিলোমিটার। অতিরিক্ত ৭৮৮ কিলোমিটার গ্রিড তৈরির কাজ চলছে বলেও শ্রী প্রধান জানান।

একটি আবেদন

ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও সকলের সহযোগিতায় গত ৭১ বছর ধরে স্বস্তিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। জাতীয়তাবাদী মানুষ হিসেবে আপনি যে কথা জানতে চান, স্বস্তিকা-র পাতায় আপনি তা পাবেন। বাজার চলতি সংবাদপত্রে যেখানে দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি থাকে না, অন্যান্য খবরের ভিড়ে আসল খবরটাই যেখানে হারিয়ে যায়, স্বস্তিকা সেখানে সত্যটাকেই তুলে ধরে। স্বস্তিকা-র বক্তব্যে তখন আপনি আপনার মনের কথাটি খুঁজে পাবেন। স্বস্তিকা-র প্রতিটি সংখ্যাই বিষয়, বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। পরিবারের সবার সঙ্গে বসে পড়ার মতো কাগজ।

৭২ বর্ষে পদার্পণকে কেন্দ্র করে স্বস্তিকা ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত গ্রাহক সংগ্রহ অভিযানের আয়োজন করেছে। ৫০০ টাকা দিয়ে আপনিও স্বস্তিকা-র বার্ষিক গ্রাহক হোন— এই অনুরোধ। স্বস্তিকা আপনার সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার প্রত্যাশী।

বিঃ দ্রঃ— ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯-এর পূর্বে গ্রাহকমূল্য (৫০০ টাকা) স্বস্তিকার কার্যালয়ে জমা দিলেই পূজা সংখ্যা (২০১৯) পাওয়া যাবে।

প্রচার প্রসার বিভাগ, স্বস্তিকা

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

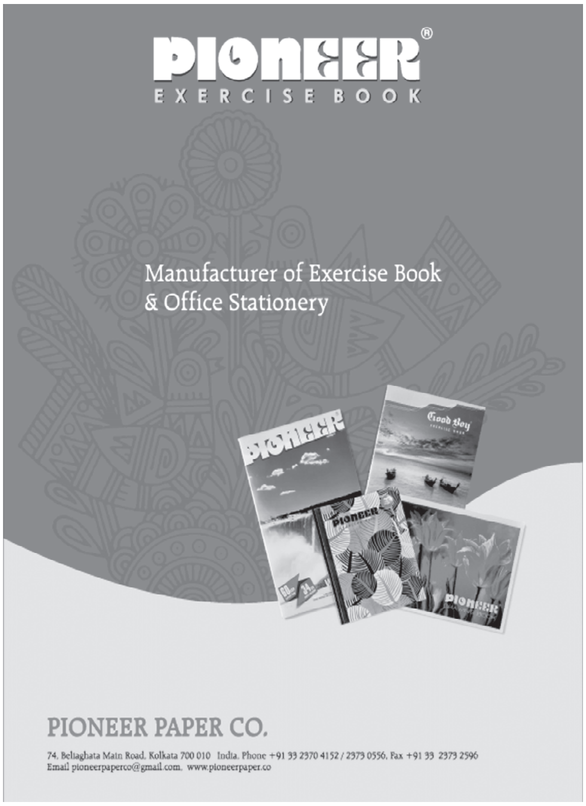

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

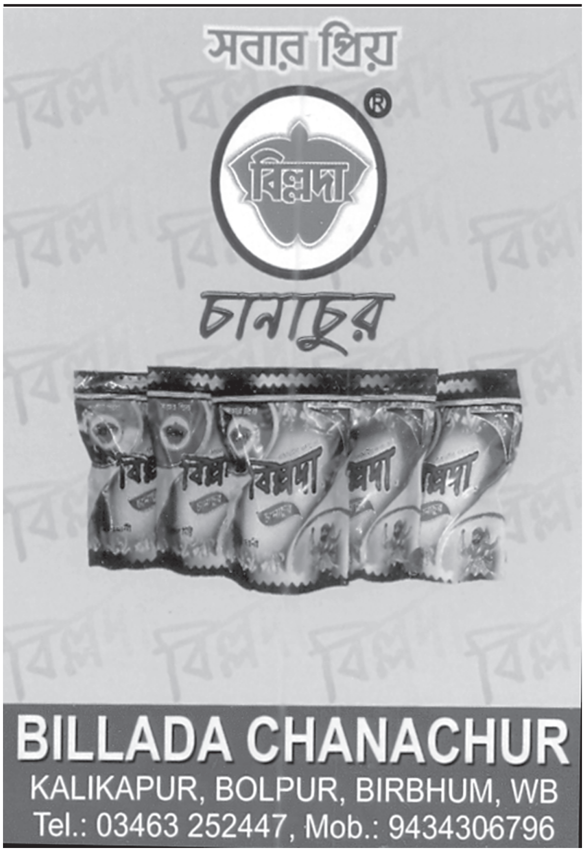

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

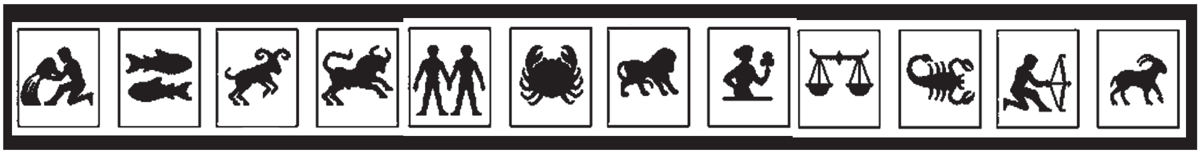

২ সেপ্টেম্বর (সোমবার) থেকে ৮ সেপ্টেম্বর (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, সিংহে রবি, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, বৃশ্চিকে বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, কেতু। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কন্যায় হস্ত নক্ষত্র থেকে ধনুতে মূলা নক্ষত্রে।

মেষ : ভ্রাতা ও প্রতিবেশীর সহানুভূতি সাহস ও দক্ষতায় কর্মক্ষেত্রে জটিল সমস্যা সমাধানে আত্মবিশ্বাস ও সৌজন্য বৃদ্ধি। অংশীদারি ব্যবসায় জটিলতা, অপরিকল্পিত ব্যয়, শারীরিক অসুস্থতায় উদ্বেগ। সামাজিক কর্মকাণ্ডে মানবিক মুখ-বিদ্যার্থীর প্রত্যয় দীপ্ত সাফল্য, বিশিষ্ট জনের সান্নিধ্য, জীবিকার নতুন দিশা।

বৃষ : স্বজন বাৎসল্য, স্বপরিবার নিকট ভ্রমণ। ব্যবসায়িক পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ, বিলাসবহুল ভাবে সুখীজীবন লাভ। আমদানি-রপ্তানি, ইলেকট্রনিক, পোশাক, সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় ধনার্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি। চাকুরিজীবীদের দায়িত্ব বৃদ্ধি। গৃহশ্রীর বৈষয়িক উন্নতি, মস্তকে আঘাত ও আলপটকা মন্তব্য বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন।

মিথুন : সরলমতি, অনুচরী, স্নেহপ্রবণ মন, সুন্দর শাস্ত্রীয় জ্ঞান তবে চিন্তার দোদুল্যমানতা ও অসতর্কতায় কর্মস্থানে ভাগ্য বিড়ম্বনা। গৃহ, বাহন, পুত্র কল্যাণে বৈভব তবে সন্তান সম্ভাবার হৃদয়বেদনার যোগ। সন্তান-সন্ততির রহস্যজনক কাজ ও গোপনীয়তা। আইনি জটিলতার আশঙ্কা। গৃহিণী সাংসারিক সমৃদ্ধির সহায়ক।

কর্কট : পরাক্রম, বাক্‌পটুতা, অহমিকা হীন প্রজ্ঞা, মাতৃ-গৃহসুখ-হৃত অধিপত্য লাভ। স্ত্রী-পুত্র, কন্যা-সহ ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীর উৎসাহ ও মনঃসংযোগ বৃদ্ধি। সহকর্মীর সঙ্গে ভুল-বোঝাবুঝি, জটিলতা। মানসিক চাপ ও উত্তেজনা। কর্মপ্রার্থীদের বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্বের সমাহারে আত্মপ্রতিষ্ঠা।

সিংহ : সন্তান-সন্ততির বুদ্ধি, চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য। প্রিয়জন ও প্রতিবেশীর অবিধিপূর্বক আচরণে ব্যথিত বোধ। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ ও দূর ভ্রমণে স্থগিত রাখুন। একাধিক পন্থায় আয়ের গতি ত্বরান্বিত। যুবক বন্ধু হিতকারী নহে।

কন্যা : বিচারশীল, শিল্পরসিক, শাস্ত্রজ্ঞ, অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি, সাহিত্যানুরাগী, কুশল ব্যাখ্যাকারী, দয়ার্দ্রহৃদয়ে পরিবারের উজ্জ্বল মুখ ও স্বাচ্ছন্দময় জীবন। ব্যবসায়ীর সফল উদ্যোগ, ভ্রাতার পেশাগত উন্নতি। গৃহিনীর বুদ্ধিমত্তায় শংসা ও সাংসারিক সমৃদ্ধি। সাংবাদিক, অনুবাদক, অ্যাকাউন্টস্ ও কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ও ম্যানেজমেন্ট কর্তাদের প্রতিভার ব্যাপ্তি ও আর্থিক স্বচ্ছলতা।

তুলা : মিত্রের মন্দ ব্যবহার ও আইনি জটিলতায় শান্ত-সংযত থাকুন। জমি-বাড়ি অথবা পরিবহণে বিনিয়োগ। একাধিক রমণীর সান্নিধ্যে অমিতব্যায়িতা, বিহ্বল চিত্ত, সময়ের অপচয় ও শারীরিক ক্লেশ। বিদ্যার্থীর পড়াশুনায় অধিক মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীদের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ, পেশাদরিত্বের পদোন্নতি। পরিবারে সদস্য বৃদ্ধির যোগ। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি, লোকসন্তুষ্টি ও নীতি-নিষ্ঠায় শংসা। বিরোধীদের চক্রান্ত ও বিতর্কিত পরিবেশ বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। স্ত্রীর শিল্প চর্চায় যশ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। শিক্ষার্থীর উচ্চ শিক্ষায় প্রবাস।

ধনু : দৃঢ় প্রত্যয় ও কর্মদক্ষতায় কারিগরি কুশলতা ও সৃজনশীলতায় বহু যোগাযোগ। নতুন ব্যবসা ও কর্মপরিকল্পনায় বাস্তবায়ন। বস্ত্র, ওষুধ, অলংকার, তরল পদার্থ ও খনিজ ব্যবসায় লক্ষ্মীর কৃপালাভ, বিত্ত আভিজাত্য বৃদ্ধি। সন্তানের চিন্তা-চেতনায় আধুনিকতার পরশ।

মকর : স্বজন সম্পর্ক, পারিবারিক পরিবেশ ও মায়ের স্বাস্থ্য বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। উদ্যোগের দক্ষতায় কর্মে সাফল্য ও শংসা। কর্মপ্রার্থী ও বিদ্যার্থীর লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপাদৃষ্টি ও ভাগ্যোদয়। তীর্থদর্শন, পুণ্যকর্ম, শত্রু মিত্রতে পরিণত। প্রবাসে রমণীর চাতক দৃষ্টিতে সাফল্যের বারিধারার সিক্ত প্রলেপ।

কুম্ভ : প্রিয়জনের পত্নীরূপের প্রকাশ। শিল্প ও সৌন্দর্যের উপাসক, দরদি মন, মিষ্ট স্বভাবের প্রকাশ। উদাসীনতায় ভালো সুযোগ হাতছাড়া হবার সম্ভাবনা। আয়ের শ্লথ গতি, লিখিত চুক্তি ও ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত রাখা শ্রেয়। বিদ্যার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও শিক্ষার আঙিনায় নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভাবক।

মীন : সফল উদ্যোগ, কর্মে স্বাচ্ছন্দ্য। নিকট ভ্রমণ, ব্যবসায় উন্নতি। দয়ার্দ্র হৃদয়ে সমাজ প্রগতিমূলক কর্মে স্বাচ্ছন্দ পদচারণা। আত্মীয় পরিবেষ্টিত সামাজিক জীবন। শিল্পী, কলাকুশলী, সাহিতিকের প্রতিভার ব্যাপ্তি, বিত্ত ও শংসা। বন্ধুস্থানীয়ের বিপদে পাশে অবস্থান ও হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ।

• *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৬

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী ত্যাগীবরানন্দ, জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস

শেখর সেনগুপ্ত - চিহ্নায়ন ● রন্তিদেব সেনগুপ্ত - অভ্রকণা, অশ্রুকণাগুলি
প্রবাল চক্রবর্তী - মহিষাসুর নির্ণাশী ● জিষ্ণু বসু - লিপা

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - ধুলো

গল্প

এষা দে, রমানাথ রায়, মালিনী চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ সিংহ,
গোপাল চক্রবর্তী

ভ্রমণ

কুণাল চট্টোপাধ্যায়— বোহেমিয়া-বাভারিয়ার ভূখণ্ডে

প্রবন্ধ

বিজয় আঢ্য, অচিন্ত্য বিশ্বাস, রঙ্গা হরি, অভিজিৎ দাশগুপ্ত, অর্ণব নাগ, জয়ন্ত ঘোষাল,
সুজিত রায়, সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম মুখোপাধ্যায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ বসু, কল্যাণ চৌবে।

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা